ডাক্তার ইউনুস আলী খান

স্মারকগ্রন্থ

ডাক্তার ইউনুস আলী খান

স্মারকগ্রন্থ

একটি একাত্তর প্রকাশনা

ডাক্তার ইউনুস আলী খান স্মারকগ্রন্থ ৩

ডাক্তার ইউনুস আলী খান

স্মারকগ্রন্থ

প্রকাশক
একাত্তর কর্তৃক প্রকাশিত

গ্রন্থস্বত্ব © প্রিসিলা খান

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৫
প্রচ্ছদ :

দাম : ৬০০ টাকা
বিদেশ : ২০ ডলার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
সিগনেট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড
ধানমন্ডি, ঢাকা

একাত্তর
১৮১ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

Dr. Yunus Ali Khan Smarokgrontho
Published by Ekattor
Copyright © Prichila Khan
Cover Design :

Price : 600 Taka
Out of Country : US $ 20

একাত্তর
181 Elephant Road, Dhaka-1205
E-mail : ekattorpublications@gmail.com
www.ekattorpublications.com
www.ekattor.org
Cell : +8801711031159
ISBN : 978-301-490-960-1

উৎসর্গ

ডাক্তার ইউনুস আলী খান

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

ভূমিকা

চিকিৎসা এক মানবিক পেশার নাম। মুনাফা বা অন্য কানো অর্জনের চেয়ে মানবসেবাই সেখানে প্রাধান্য পায়। হাজার হাজার বছর ধরে চিকিৎসার এই মানবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক সুলতান গাজী সালাহউদ্দিন ঘোরতর শত্রুপক্ষের অধিনায়ক ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ডের অসুস্থতার খবর শুনে ছদ্মবেশে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। গাজী সালাহউদ্দিন নিজেই ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাই পরম শত্রু হলেও, বিপদে তাঁর সেবা করাকে কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

আমাদের শাহজাদপুরের ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান তেমনই একজন চিকিৎসক ছিলেন। ধনী-গরিব, দল-মত নির্বিশেষে সমানভাবে সকলের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। 'গরিবের ডাক্তার' বলে খ্যাত এই চিকিৎসকের অর্থের কোনো মোহ ছিল না। ফি হিসেবে যে যা দিতেন, তিনি সেটাই সাদরে গ্রহণ করতেন। গরিব লোকেরা যাঁরা ফি দিতে পারতেন না, তিনি তাঁদেরকে উল্টো ওষুধ কেনার টাকা এমনকি প্রয়োজনে বাড়ি ফেরার ভাড়া দিয়ে দিতেন। মানুষের জন্য এমন অকৃত্রিম হৃদয়বান বন্ধু চিকিৎসক সত্যিই বিরল।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনে করোনা (কোভিড-১৯) দেখা দেওয়ার পর, মার্চের মধ্যেই সারা বিশ্বে মহামারি আকার ধারণ করে। এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকায়, শুরু হয় মৃত্যুর মিছিল। স্থবির হয়ে যায় গোটা বিশ্বের জনজীবন। সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। রোগটি মারাত্মক ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে, অনেক চিকিৎসক রোগী দেখা বন্ধ করে দেন। কিন্তু আমাদের ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একবেলার জন্যও রোগীর চিকিৎসাসেবা দেয়া থেকে বিরত থাকেননি। এ কারণে তিনি কখন যে কোভিডের ভয়াল থাবায় আক্রান্ত হন, তিনি নিজেও তা বুঝতে পারেননি। করোনাকালীন এই বীর সন্মুখ-যোদ্ধা জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তারপর ২৪ জুন, ২০২০ ঢাকার ইমপালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বড় মেয়ে রিতা আমেরিকা প্রবাসী। আমরা রিতার কয়েকজন বন্ধুমিলে 'ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মারকগ্রন্থ' নামে এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে আমরা শাহজাদপুরবাসী ও শাহজাদপুরের প্রবাসী এবং তাঁর সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, এমন মানুষের কাছে লেখা আহ্বান করি। তাতে আমরা ব্যাপক সাড়া পাই। স্মারকগ্রন্থটি থেকে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের

জীবন এবং মানুষের সেবায় তিনি কতটা আত্মনিবেদিত ছিলেন, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

'ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশে তাঁর স্ত্রী, তিন মেয়ে—ডাঃ ইসমত আরা রিতা, কানিজ ফাতেমা মিতা ও ড. প্রিসিলা খান মলি তাঁর সম্পর্কে নানা রকম তথ্য ও বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বন্ধুআব্দুর রাজ্জাক, সজল, রনি, আব্দুল খালেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের অবদানকে স্মরণ করছি। যাঁরা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি যাঁর অবদানের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমাদের বন্ধুইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ। তিনিই সর্বপ্রথম স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তাঁর নানা দিক-নির্দেশনা ও মতামতের বিষয়টি অনস্বীকার্য।

চিকিৎসাসেবায় চিকিৎসকদের অনেক নেতিবাচক ভূমিকার কথা আছে। আমরা 'ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে চাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই--আমাদের দেশে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের মতো হৃদয়বান চিকিৎসক ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তা না হলে আমরা আছি কীভাবে? কীভাবে টিকে আছে আমাদের এই বাংলাদেশ? চিকিৎসকদের মনুষ্যত্ববোধ আরো জাগ্রত হলে, দেশের চিকিৎসাসেবার চিত্র অনেক বদলে যেত। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে। চিকিৎসাসেবার বিষয়ে আমরা সেই আশায়ই রইলাম।

বাবুল আকতার খান

আমার স্মৃতিতে ডা. ইউনুস আলী খান

প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

ডা. ইউনুস আলী খান এবং আমি জন্মসূত্রে বৃহত্তর পাবনা জেলার অধিবাসী। ইউনুস সাহেবের জন্ম ১৯৪৪ সালে পাবনা জেলার সদর থানায়। আমার জন্ম ১৯৩৭ সালে তৎকালীন পাবনা জেলার শাহজাদপুর থানায়। হিসেব করলে দেখা যাবে আমার সাথে তার বয়সের ব্যবধান ৭ বছর। ছাত্রজীবনে তার সাথে আমার কোনোরকম আলাপ-পরিচয় ঘটেনি। তবে তিনি যে সময় পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আইএসসি এবং বিএসসি পর্যায়ে লেখাপড়া করেছেন সম্ভবত সেই সময়েই আমি এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করেছি। এডওয়ার্ড কলেজে বাংলা বিভাগে আমার অধ্যাপনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪ সাল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ডা. ইউনুস আলী খান শাহজাদপুরের পোতাজিয়া সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসেবে ১৯৭২ সালে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এর আগে শাহজাদপুরে আমরা এমবিবিএস ডাক্তার কখনও দেখিনি। সেকালের সবাই ছিলেন এলএমএফ ডাক্তার। শাহজাদপুর আমার নিজ থানা। নিজ থানায় এত বড় মাপের একজন ডাক্তার পাওয়া গেল, এ খবরে আমরা বেশ খুশি হয়েছিলাম। আমরা গ্রামে না থাকলেও আব্বা-মায়ের গ্রামে অবস্থান করতেন। তাঁদের অসুখের সময় একজন ভালো ডাক্তারের চিকিৎসা পাওয়া যাবে, এটাই ছিলো আমাদের জন্য পরম স্বস্তির খবর।

ডা. ইউনুস ছিলেন একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হৃদয়ে লালন করতেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তিনি সবসময় স্পষ্ট কথা বলতেন। যে কারণে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যার পর তৎকালীন সামরিক সরকার ডা. ইউনুসের ওপর নানাভাবে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। একপর্যায়ে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. ইউনুসকে পোতাজিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অন্যত্র বদলি করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ডা. ইউনুস বুঝতে পারেন জিয়াউর রহমান সরকার কোথাও তাঁকে শান্তিতে চাকরি করতে দেবে না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাদ দিয়ে সরকারি চাকরি করতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করতে রাজি হননি। একপর্যায়ে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শাহজাদপুরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করেন। পোতাজিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার হিসেবে তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যার ফলে তিনি যখন শাহজাদপুরে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করেন, তাঁর

ডাক্তারখানায় রোগীদের প্রচণ্ড ভিড় জমতে থাকে। গরিব রোগীদেরকে তিনি কোনোরকম ফি ছাড়াই চিকিৎসা সেবা দিতে শুরু করেন, এর ফলে এলাকায় তিনি গরীবের ডাক্তার বলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ছুটির সময় আমরা গ্রামের বাড়িতে গেলেই মানুষের মুখে ডা. ইউনুসের খুব প্রশংসা শুনতাম।

একবার আমাদের আব্বা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন আমি বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম। সেকালে ফোনের ব্যবস্থা ছিলো না। শাহজাদপুরে লোক পাঠালাম ডা. ইউনুসকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে। রাস্তা-ঘাট তখন খুব খারাপ ছিল। আব্বাকে শাহজাদপুরে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা ছিল না। লোক মারফৎ আব্বার অসুস্থতার খবর শুনে ডা. ইউনুস তাঁর সাইকেল নিয়ে আব্বাকে দেখতে আসেন। সাইকেল নিয়ে শাহজাদপুর থেকে আমাদের গ্রামে আসা সেকালে খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিল। ডা. ইউনুস পথের সমস্ত কষ্টকে মেনে নিয়েই আব্বাকে চিকিৎসা দিতে চরনবীপুর আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। যেহেতু আমাদের আব্বা একজন খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসক ছিলেন, ডা. ইউনুস স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নীতিগতভাবে তিনি আমাদের আব্বার চিকিৎসার জন্য কোনো ফি নেবেন না। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁর হাতে টাকা তুলে দিতে পারিনি। এটি শুধু একবার নয়, আমাদের আব্বা-মায়ের যখনই কোন জটিল অসুখ হয়েছে, খবর পাওয়ার সাথে সাথে সাইকেল নিয়ে তিনি আমাদের বাড়িতে ছুটে এসেছেন এবং আব্বা-মায়ের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। চিকিৎসার জন্য কখনও তিনি টাকা গ্রহণ করেননি। পরে খবর নিয়ে জেনেছি, টাকা না নিয়ে চিকিৎসা করা ছিল তাঁর স্বভাব। বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষদেরকে তিনি ফ্রি চিকিৎসা দিতেন। চিকিৎসা পেশাটিকে তিনি জনসেবা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো ডা. ইউনুস হলেন গরীবের ডাক্তার।
ডা. ইউনুসের সাথে প্রথম যখন আমাদের গ্রামের বাড়িতে আলাপ-পরিচয় হয়, তখন তাঁর রাজনৈতিক দর্শন আমার জানা ছিলো না। তবে এটুকু জানতাম তিনি মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে তিনি অন্তরে লালন করেন। তবে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ডা. ইউনুসের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জগৎটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নৃশংসভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহাবিপর্যয় দেখা দেয়। দেশে সামরিক শাসন জারি, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর অসহ্য অত্যাচার, নির্যাতন, মৌলবাদী শক্তির উত্থান, জাসদের ভুল পথে যাত্রা, সব মিলিয়ে দেশ তখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এক মাসের মধ্যে বড়ভাই ড. মযহারুল ইসলামকে জেলাখানায় বন্দি করা হয়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার আগেই শাজহাদপুরে নানা রকম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার আগে ড. মযহারুল ইসলাম যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করছিলেন, শাজহাদপুরের সন্তান জনাব আবদুর রহমান তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তখন

শিক্ষকদের মধ্য থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের পরিচর্যা করতেন ড. মযহারুল ইসলাম। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন জনাব আবদুর রহমান। যতদূর জানা যায়, জনাব আবদুর রহমানের মনোনয়নের ব্যাপারে ড. মযহারুল ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশ স্বাধীন হবার পর শাহজাদপুরে মারাত্মক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ এবং জাসদের মধ্যে বিরোধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ১৯৭২ সালে একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে জনাব আবদুর রহমানের ছোট ভাই 'সরবত' প্রাণ হারায়। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। 'সরবত' হত্যার অল্পকিছুদিন পরেই দেখা যায় জনাব আবদুর রহমান সমর্থিত কর্মীদের গুলিতে জাসদের বেশ ক'জন নেতা প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁদের কবর এখনও শাহজাদপুর কলেজ চত্বরে দৃশ্যমান। ১৯৭২-৭৩ সালে শাহজাদপুরে রাজনৈতিক খুনোখুনি, হানাহানি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, জনাব আবদুর রহমানের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। তার জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তাঁকে মনোনয়ন না দিয়ে মনোনয়ন দেয়া হয় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব বকুলের ভাই জনাব মুকুলকে। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মুকুল জয়লাভ করেন বটে, তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে জনাব মুকুলের ছোটভাই জনাব ফকরুল প্রতিপক্ষের হাতে নৃশংসভাবে খুনের শিকার হন। বঙ্গবন্ধু হত্যার আগেই এই যখন শাহজাদপুরের রাজনৈতিক বেহাল অবস্থা, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর শাহজাদপুরের রাজনৈতিক অঙ্গন আরও কতটা তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কিছু সময়ের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন থমকে গিয়েছিলো। শুধু আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে নয়, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মযহারুল ইসলামকেও জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়। প্রায় ৩ বছর বন্দি থাকার পর উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে ড. আবদুল মতিন চৌধুরী এবং ড. মযহারুল ইসলাম জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করেন। জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে এসেই প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে বুদ্ধিজীবীদেরকে সংগঠিত করবার কাজে হাত দেন, ঢাকায় দেশের বড় মাপের বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠন করেন 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ'।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠনের পরেই দৃষ্টি দেয়া হয় রাজশাহী এবং চট্টগ্রামের দিকে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীতে আমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'রাজশাহী জেলা বঙ্গবন্ধু পরিষদ'। এর পরপরই ডা. ইউনুস শাহজাদপুরে বঙ্গবন্ধু পরিষদের একটি শাখা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যে সময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ প্রায় নিষিদ্ধ, সেই সময় শাহজাদপুরের মতো একটি মফস্বল এলাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ।

যেহেতু আমি শাহজাদপুরের মানুষ, সেখানে 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' গঠন করতে পারলে আমার কাজের সুবিধা হবে, সে কথা বিবেচনা করে আমি শাহজাদপুরে 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' গঠনের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করি। মূলত ডা. ইউনুসের সাহস, মনোবল, আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আনুগত্যের ফলেই শাহজাদপুরে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয়েছিলো। তাঁর আহ্বানে আমাকে মাঝে মাঝে শাহজাদপুরে বঙ্গবন্ধু পরিষদের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতো।

বড়ভাই ড. মযহারুল ইসলাম ১৯৭৮ সালের দিকে জেলখানা থেকে মুক্তি পেলেও জিয়া সরকারের নানারকম নির্যাতনমূলক পদক্ষেপের ফলে ড. মযহারুল ইসলাম দেশে থাকতে পারেননি। ভারতে দীর্ঘকাল তাঁকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়। আশির দশকের শেষ পর্যায়ে নির্বাসিত জীবন শেষ করে ড. মযহারুল ইসলাম যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভাই তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পুত্র চয়নকে সাথে নিয়ে শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগকে সংগঠিত করবার কাজ শুরু করেন। শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগের তখন খুব করুণ অবস্থা বিরাজ করছিল। মযহারুল ইসলামকে শাহজাদপুরের মাটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করতে দেখে ডা. ইউনুস খুব খুশি এবং আশান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি মযহারুল ইসলামকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ডা. ইউনুস বঙ্গবন্ধু পরিষদের অনুষ্ঠানে ড. মযহারুল ইসলামকে ঘনঘন আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। এর ফলে ড. মযহারুল ইসলামের সাথে ডা. ইউনুসের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৯০ সালের সংসদ নির্বাচনে ড. মযহারুল ইসলাম যখন শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী হিসেবে মাঠে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন, ডা. ইউনুস নিজে ড. মযহারুল ইসলামের পক্ষে জনসাধারণের কাছে ভোট চাইতে থাকেন। শুধু মাঠে নয় তার নিজের চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসতেন, তাদের কাছেও তিনি ড. মযহারুল ইসলামের জন্য ভোট চাইতেন। এর ফলে তৎকালীন বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের সাথে ডা. ইউনুসের বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে তাঁকে নানারকম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে এসব নির্যাতন, প্রতিকূলতাকে তিনি কখনও পাত্তা দেননি। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে ড. মযহারুল ইসলামের পরাজয়ে ডা. ইউনুস খুব কষ্ট ও বেদনা অনুভব করেছিলেন।

এরপর ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে শাহজাদপুর এলাকাতে পুনরায় ড. মযহারুল ইসলামকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়। ডা. ইউনুস এবারেও ড. মযহারুল ইসলামের পক্ষে সবার কাছে ভোট চাইতে থাকেন। শাহজাদপুরে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনটি ছিল অত্যন্ত জটিল নির্বাচন, কারণ এইবার প্রথম জনাব হাসিবুর রহমান স্বপন বিএনপির প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ড. মযহারুল ইসলামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। জাতীয় প্রার্থীর প্রার্থী হিসেবে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ডা. আবদুল মতিন। ডা. আবদুল মতিন ছিলেন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, অনেক সিনিয়র চিকিৎসক। তিনি ছিলেন ডা. ইউনুসের শিক্ষকতুল্য। তাই বলে ডা. ইউনুস আদর্শের ক্ষেত্রে কোনোরকম সমঝোতা করার মানুষ ছিলেন না। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মানুষ ড. মযহারুল ইসলামকেই অত্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ডা. ইউনুস সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শাহজাদপুর বসে নির্বাচনে প্রকাশ্যে ড. মযহারুল ইসলামকে সমর্থন দান করায় তৎকালীন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জনাব হাসিবুর রহমান স্বপনও ডা. ইউনুসের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, কিন্তু ডা. ইউনুস তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি সব সময় অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ডা. মযহারুল ইসলাম প্রায় জিতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের কারণে শেষপর্যন্ত নির্বাচনে তাঁকে পরাজিত হতে হয়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন ডা. ইউনুস। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের সাথে স্থানীয় আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নেতা সম্পৃক্ত ছিলেন, ডা. ইউনুস কখনও তাঁদেরকে মেনে নিতে পারেননি, সব সময় তিনি ষড়ন্ত্রকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতেন।

ড. মযহারুল ইসলামকে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হারিয়ে দেয়া হয়েছিলো। উক্ত ষড়যন্ত্রের সাথে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা কৌশলে বিএনপির যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে আওয়ামী লীগে নিয়ে এসেছিলেন, আইনের দৃষ্টিতে তা ছিলো অবৈধ। যার ফলে উক্ত নির্বাচনী ফলাফলকে বাতিল করে দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে পুনরায় উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক অনুরোধ করেও উক্ত উপনির্বাচনে ড. মযহারুল ইসলামকে দাঁড় করানো যায়নি। বাধ্য হয়ে তাঁর পুত্র চয়ন ইসলামকে উক্ত উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উক্ত উপনির্বাচনে চয়ন ইসলামের পক্ষে ডা. ইউনুস বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনী ফলাফল চয়ন ইসলামের পক্ষে আসে। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব হাসিবুর রহমান স্বপন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রাথী চয়ন ইসলামের কাছে অনেক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। ডা. ইউনুস চয়ন ইসলামের বিজয়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আমাকে করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আমি যেহেতু রাজশাহী জেলা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি। সেই সময় শাহজাদপুর বঙ্গবন্ধু পরিষদের এক অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথির পদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডা. ইউনুসের আমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আয়োজনটি খুব সফল হয়েছিলো। আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ডা. ইউনুস বেশ গর্ব করতেন। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে চয়ন ইসলামের পরাজয়ে ডা. ইউনুস খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন

আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে চয়ন ইসলামকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছে।

২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় শাহজাদপুর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম আত্মকলহ বিরাজ করছিলো। সেনা সমর্থিত শাসকদের রোষানলে পড়ে জনাব মোহাম্মদ নাসিম তখন জেলখানায় বন্দি, জনাব লতিফ মির্জা তখন প্রয়াত। শাহজাদপুরে চয়ন ইসলাম এবং জনাব হাসিবুর রহমানের কর্মীরা তখন আত্মকলহে লিপ্ত।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম চয়ন-স্বপনের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সমঝোতা না করতে পারলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি সুনিশ্চিত। যেহেতু আমি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা, শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলাম। চয়ন-স্বপনের বিরোধ মিটিয়ে দেয়ার ফলে ২০০৮ সালে শাহজাদপুর আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে চয়ন ইসলাম বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলো। ডা. ইউনুস যেহেতু শাহজাদপুরে অবস্থান করতেন, শাহজাদপুর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো তাঁর জানা ছিলো। সমস্যা সমাধানে আমি ডা. ইউনুসের সহযোগিতা নিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবার পর সরকারের কাছে আমার দাবি ছিলো শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। দাবিটি আমি একটি লেখার মাধ্যমে করেছিলাম। আমার লেখার শিরোনাম ছিলো– 'শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' লেখাটি 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার লেখাটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে শুরু হয় শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন। ডা. ইউনুস এবং আমার ছাত্র প্রফেসর নাছিম উদ্দিন মালিথা আমাকে শাহজাদপুরে গিয়ে আন্দোলনের একটা রূপরেখা তৈরি করে দিতে অনুরোধ জানান। তাঁদের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। ২০০৯ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি শাহজাদপুরে গিয়ে গঠন করি 'শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি'। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আমার নাম রাখা হয়েছিল, সদস্য সচিব ছিল আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক নাসিম উদ্দিন মালিথা। আমি রাজশাহীতে অবস্থান করতাম, আন্দোলনকে গতিশীল রাখবার জন্য যে পরিমাণে সময় দেয়া প্রয়োজন, আমি তা দিতে পারতাম না। আন্দোলনকে গতিশীল রাখবার লক্ষ্যে আমি কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলাম ডা. ইউনুসকে। পদ নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতেন না ডা. ইউনুস, কাজটাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। তৎকালীন সংসদ সদস্য জনাব চয়ন ইসলামের সাথে যোগাযোগ রেখে 'শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি' অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনে বেশ জটিলতা দেখা দেয়। কুষ্টিয়া থেকে দাবি করা হয় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত

স্থান কুষ্টিয়ার 'শিলাইদহ'। নওগাঁ থেকে দাবি ওঠে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যথার্থ স্থান নওগাঁর 'পতিসর'। স্থান নির্বাচনের এই জটিলতা নিরসনে বেশ ক'বছর সময় কেটে যায়।

২০১৩ সালের সংসদ নির্বাচনে শাহজাদপুরের কর্মরত সংসদ সদস্য জনাব চয়ন ইসলামকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ থেকে মনোয়ন দেয়া হয় জনাব হাসিবুর রহমান স্বপনকে। চয়ন ইসলামকে মনোনয়ন না দেয়ায় ডা. ইউনুস যে খুব মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, সে কথা প্রকাশ্যে বলতে ডা. ইউনুস কখনও দ্বিধা করতেন না। আদর্শ পালনের ক্ষেত্রে তিনি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। তাঁর কথা শুনে কে কি মনে করলো, এ নিয়ে কখনও তিনি ভাবতেন না।

শাহজাদপুরে কেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, এ বিষয়ে কয়েক বছর ধরে আমাকে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ ছিলো– ঠাকুর জমিদারদের যে পরিমাণ জমি শাহজাদপুরে 'খাস' জমি হিসেবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, শিলাইদহ বা পতিসরে তেমন খাস জমি পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন জরিপে আমার সে বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং শেষপর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্য কারও জমিতে নয়, রবীন্দ্র পরিবারের নিজস্ব জমি শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। এরপর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পালা।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের তারিখ নির্ধারিত হয় ২০১৫ সালের ৮ই মে। সে সময় শাহজাদপুরের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন জনাব হাসিবুর রহমান স্বপন। তাঁর পূর্ববর্তী সংসদ সদস্য চয়ন ইসলামের সময়েই শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিংহভাগ কাজ হয়ে গিয়েছিলো। এখন শুধু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পর্ব।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শাহজাদপুর ফুটবল খেলার মাঠে। বিশাল আয়োজন। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা হিসেবে আমি এবং আওয়ামী লীগের নির্বাহী পরিষদ সদস্য হিসেবে 'কবিতা' আমরা দু'জনই ভি.আই.পি কার্ড পেয়েছিলাম। খবর নিয়ে জানা গেলো প্রাক্তন সংসদ সদস্য চয়ন ইসলামকে ভি.আই.পি কার্ড দেয়া হয়নি। এর ফলে চয়ন ইসলাম অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চায়নি। আমরা তাকে অনুষ্ঠানে থাকতে অনুরোধ করি। চয়ন আমাদের কথা রেখেছিলো। অনুষ্ঠানে গিয়ে সে একটু পেছনের সারিতে বসেছিলো। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ঢুকতেই চয়নের দিকে দৃষ্টি দেন এবং চয়নকে সামনের ভিআইপি সারিতে নিয়ে আসবার নির্দেশ দেন।। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যবোধ দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি উপাচার্য হিসেবে শুরুটা ভালোই করেছিলেন, তবে শাহজাদপুরের অসুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে

শেষটায় ভালো করতে পারেননি। এজন্য তৎকালীন শাহজাদপুরের কতিপয় রাজনৈতিক নেতা এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তাকে দায়ী করা যায়। সেই সময় 'শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি'র যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের কোনোরকম সম্মান দেয়া বা মূল্যায়ন করা হয়নি। বিশেষ করে ডা. ইউনুস এবং প্রফেসর মালিথা তখন শাহজাদপুরেই অবস্থান করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে কোনোরকম পরামর্শই নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে যখন অভিযোগ উঠলো, ডা. ইউনুসকে খুব মর্মপীড়া অনুভব করতে দেখেছি।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ করতে গিয়েই মূলত ডা. ইউনুসের সাথে আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন মানবদরদী। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিলো অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। ডা. ইউনুস যেন বাংলাদেশের সংবিধানেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর চরিত্রে মহামানবিক গুণাবলী ছিলো। মহান এই মানুষটি করোনায় আক্রান্ত রোগীদেরকে সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

লেখক: প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

আমার দেখা বাতিঘরের সেই বাতিটি

ড. রইস উদ্দিন মিয়া

শাহজাদপুরের বাতিঘরের সেই বাতিটি নিভে গেছে। ঘরখানি আজ অন্ধকার। বাতিটি ছিল একটি আরোগ্য প্রদীপ। এর আলোক-রশ্মিতে রোগ নিরাময় হতো। অঞ্চলের মানুষের কাছে বাতিটি ছিল ইউনুস ডাক্তার নামে পরিচিত। শাহজাদপুরের দীর্ঘদিনের প্রথিতযশা বিজ্ঞ চিকিৎসক।

সেদিন সকালে উঠে ফজরের নামাজ পড়েছি মাত্র। কোরান তেলাওয়াতে বসব। আমার গিন্নি বলল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে খবর হয়েছে-- শাহজাদপুরের বাতিঘর ডাঃ ইউনুস আর নেই। মোবাইল ফোনে ছবিসহ খবরটি আমাকে এনে দেখাল। অনেকদিনের চেনা নিরহংকার মনের শান্ত সৌম্য নিষ্পাপ চেহারার মানুষটির ছবি দেখামাত্র বুকের ভেতর ধপ করে উঠল। কারণ, 'শাহজাদপুরের বাতিঘর' উপাধি পাওয়া এই মানুষটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার প্রায় অর্ধশত বছরের শত-সহস্র স্মৃতি।

ডাঃ ইউনুসের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আজ থেকে ৪৭ বছর আগে পোতাজিয়া সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি ফাইনাল ইয়ারে পড়ি। এর কিছুদিন আগে তিনি এখানে এসে যোগদান করেছেন। এর মধ্যেই তাঁর বাতির আলো চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ছুটিতে বাড়ি এসেছি। হঠাৎ করে আমার আব্বা লিভারের প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। আব্বা বললেন, শুনেছি পোতাজিয়া হাসপাতালে নাকি একজন পাশ করা ভালো ডাক্তার এসেছে। দেখ তো তাঁকে আনা যায় কি না।

পরদিন সকালে উঠে ৪-৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে পোতাজিয়ায় গেলাম। দেখা হলো ওনার সাথে। সমস্যা বললাম। এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় কী করি। কথা শেষে আমাকে বললেন, আপনি চলে যান। আমি আসছি। রোগীকে দেখতে হবে। মনে আছে, ওই সময় পোতাজিয়া ইউনিয়নের মোহন চেয়ারম্যান সাহেব বসা ছিলেন।

চৈত্র মাস। দুপুরে কাঠফাঁটা রোদ। এই রোদের মধ্যে তিনি বাই-সাইকেল নিয়ে আমাদের বাড়িতে (বারাবিল মঙ্গলদহ) এলেন। আব্বার মুখে সব শুনলেন। পানি গরম করতে বললেন। আব্বার গায়ের গেঞ্জি উপরে উঠিয়ে প্রায় ২০-২৫ মিনিটের মতো পেটের ডান পাশটা চাপ দিয়ে দেখলেন। নিবিষ্ট মনে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে কলম দিয়ে এক জায়গায় ছোট্ট একটি ফোঁটা দিলেন। গরম

পানি আর একটা বাটি চাইলেন। এরপর বড় সাইজের একটা ইনজেকশন সিরিঞ্জ বের করে গরম পানিতে ধুইয়ে, কলম দিয়ে ফোঁটা দেয়া জায়গায় সরাসরি সুঁচ পুশ করে দিলেন। এরপর সিরিঞ্জ লাগিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন। হালকা হলদে রংয়ের গাঢ় পুঁজে সিরিঞ্জ ভরে গেল। সিরিঞ্জ খুলে পুঁজ বাটিতে ফেলে সেটা আবার লাগালেন। আবার টানলেন। একই অবস্থা। এভাবে বার বার টেনে প্রায় আধা লিটারের মতো পুঁজ বের করার পর কাজ শেষ করলেন। সবাই অবাক। আব্বা তৎক্ষণাৎ উঠে বসে পড়লেন। বললেন, আমি ভালো হয়ে গেছি। তিনি একটু মুচকি হাসলেন।

যাওয়ার সময় জানতে চাইলাম, কত ভিজিট দেব? বললেন, আজ না। কাজ শেষ হয়নি। আগামীকাল আবার আসতে হবে। রেডি থাকবেন। পরদিন ঠিক একই সময়ে এলেন। একই কাজ করলেন। এবারও একই পরিমাণ পুঁজ বের হলো। ভিজিটের কথা জানতে চাইলে বললেন, আগামীকালও আসতে হবে। পরদিন এলেন। কিন্তু এ দিন বার দুয়েক টানার পর রক্ত দেখা গেল। টানা বন্ধ করলেন। সাদা কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। অবিলম্বে ওষুধ শুরু করতে বললেন। ফাঁকে এসে আমাকে আস্তে বললেন, ওনার লিভার অ্যাবসেস হয়েছে। বেশ খারাপ অবস্থা। এ রোগের ফল তো সাধারণত ভালো হয় না। দেখা যাক। আল্লাহ ভরসা।

আমি শুধু আশ্চর্য হলাম ওনার দীর্ঘসময় ধরে ইনজেকশন পুশ করার স্থান নির্ণয় করা, সাহস আর দক্ষতা দেখে। গাঁয়ে বসে বিরাট সার্জারির কাজ সেরে ফেললেন! বিদায়ের সময় অনেক সংকোচ মনে একশ টাকার একটা নোট হাতে দিলাম। বললেন, এত দিচ্ছেন কেন? মানি-ব্যাগ বের করে ৪০ টাকা ফেরত দিলেন। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। একটু মুচকি হেসে বললেন, ঠিকই নিয়েছি। বেশি দিচ্ছেন কেন?

৩

আব্বা ভাল হয়ে গেলেন। এরপর বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ ১৬ বছর। লিভারে আর কখনও তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি। সেই তো ডাঃ ইউনুসের সাথে শুরু। এক সময় সখ্যতা। আমার কর্মস্থল ছিল খুলনায়। অনেক দিন পর পর বাড়ি আসতাম। এলেই দেখা করতাম। ব্যস্ততার মধ্যেই কথা বলতেন। কথা হতো আব্বা-আম্মার শরীর- স্বাস্থ্য নিয়ে। তাঁদের অন্তিম পর্যন্ত উনিই চিকিৎসা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন কনফিডেন্ট ডাক্তার। রোগ নির্ণয় করার তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

বড় সম্মান করতেন আমাকে। খবর দিলে ফেলতেন না। আমি একবার তাঁকে অন্ধকার দুপুর রাতে নদী পাড়ি দিয়ে চরনবীপুর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। ৮৮-এর ভয়াবহ বন্যার সময় ওনার সাথে আরেক স্মরণীয় স্মৃতি। ওই কঠিন দুঃসময়ে আমার আম্মার স্ট্রোক করেছিল। খবর শুনে খুলনা থেকে বাড়িতে এলাম। ঈশ্বরদী-পাবনা হয়ে বাঘাবাড়ি পর্যন্ত এসে আটকে গেলাম। বন্যার ভয়ংকর দৃশ্য দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি, মাকে বাঁশের খুঁটির উপর চৌকি বসিয়ে তার উপরে শোয়ানো আছে। ঘরের মধ্যে হাটুপানি। উঠানে উরু পানি। দিলরুবা সিনেমা হলের

ওখানে বিশ্বরোডের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে পানি একপাশ থেকে আরেক পাশে প্রবাহিত হচ্ছে। বিকেলে ছোট একটা ডিঙা নৌকায় আব্বাকে সাথে নিয়ে ডাঃ ইউনুসের ছয়আনি পাড়ার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম, তাঁর ঘরের অর্ধেকটাই প্রায় পানির নিচে। ভেতর থেকে প্রবল বেগে পানির স্রোত বইছে। ডাকতেই তিনি বুক পানি ভেঙে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। গায়ে ভেজা স্যান্ডো গেঞ্জি। আমি দেখে হতভম্ব। আমাকে দেখেই চিরচেনা সেই একটু মুচকি হাসি দিলেন। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, আপনার আম্মার মাইল্ড স্ট্রোক করেছে। গতকাল ওষুধ লিখে দিয়েছি। তাঁকে আগে পানির ভিতর থেকে সরিয়ে খুলনায় নিয়ে যান। এরপর যা বললেন, শুনে শিউরে উঠলাম। তার শিশু বাচ্চা ঝুলন্ত বাঁশের তৈরি মাচা থেকে গত রাতে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে বহু কষ্টে খুঁজে পেয়েছেন। আল্লাহর রহমত। অঘটন ঘটেনি আর কি। নিজের এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও ভেজা গেঞ্জি গায়ে বুক পানিতে দাঁড়িয়ে আমাকে এতটা সময় দিলেন। তাঁর মানবিক গুণ সম্বন্ধে কী বলা যায়! দৃশ্যটি আজও ভুলতে পারিনি।

আমার বাবা আর মায়ের কঠিন অসুখের এই দুটো স্মৃতি যখনই মনে হয়, কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রতি মাথা নুইয়ে আসে। আসলেই তিনি ছিলেন বিপন্ন মানুষের বাতিঘর। বর্ষা বন্যা ঝড় তুফান দুর্যোগ মাথায় নিয়ে যাঁরা অসুস্থ মানুষের সেবার অপেক্ষায় রাতের আঁধারেও বাতি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁরাই তো বাতিঘর। তাঁরাই তো স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর পছন্দের বান্দা। এসব মানুষকে নিয়েই তো কবি কামিনী রায় লিখে গেছেন...

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

ইউনুস ডাক্তার আজীবন যেভাবে নিজের কথা ভুলে গিয়ে মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবা দিয়েছেন, নিজের জীবন বলি দিয়ে জীবনঘাতী 'করোনা'য় বিপন্ন মানুষের সেবায় নিজেকে বিলীন করে দিয়ে শাহজাদপুরবাসীকে হাত নেড়ে বলে গেলেন--"এবার তাহলে আসি"। তাঁর এ প্রয়াণ বড়ই দুঃসহ, বড়ই বেদনার। তাঁর চলে যাওয়া সবাইকে কাঁদিয়েছে। সবার হৃদয় ছুঁয়েছে। হে প্রভু! আজ তব কাছে মোদের এটুকু শুধু মিনতি—আমাদের বাতিঘরের যে বাতিটি তুমি নিয়ে গেছ, যে বাতিটি আমাদের শাহজাদপুরকে আলোকিত করে রেখেছিল, তার চিরঅন্ধকার রুদ্ধ ঘরখানি তুমি বাতি জ্বেলে আলোকিত করে দাও।

স্মরণীয় ডাঃ ইউনুস আলী খান

মতিউর রহমান লাল্টু

কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাদের সাথে সরাসরি খুব বেশি দেখা সাক্ষাত না হলেও মনে হয় তাঁরা অনেক পরিচিত, এটা হয় যখন সেই মানুষটার সাথে আদর্শিক মিল থাকে । ডাঃ ইউনুস আলী খান সাহেব তেমনি একজন মানুষ, তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে একবারই একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে কিন্তু তারপরও মনে হয় তিনি খুব কাছের একজন, এর কারন আমাদের আদর্শগত মিল। তিনি আমার নেতা বঙ্গবন্ধু পরিষদএর সাবেক সভাপতি মরহুম এস এ মালেক সাহেবের সাথে রাজনীতি করেছেন, ডাঃ ইউনুস আলী খান শাহজাদপুর বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সভাপতি ছিলেন, সে সূত্রে তাঁর আদর্শ এবং কাজের পরিধি নিয়ে কিছুটা জানার সুযোগ আমার হয়েছে। যত তাঁর সম্পর্কে জেনেছি তত মনে হয়েছে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন নিয়ে সম্পূর্ন আলোকপাত করা আসলে একজনের পক্ষে দুরহ। তাঁর চরিত্রের অনেকগুলো দিক, তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক, তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় চিকিৎসক হিসাবে ভুমিকা রেখেছেন, সারাজীবন বগ্ঙবন্ধুর রাজনীতি করেছেন, তিনি বাক্তিজীবনে একজন সফল পিতা, একজন শিক্ষানুরাগী, সমাজসংস্কারক ও সমাজসেবক। তিনি একজন সৎ, ধর্ম নিরপেক্ষ, মানবতাবাদী চিকিৎসক ছিলেন এটা তাঁর সবচে বড় পরিচয়, তবে আমার কাছে ডাঃ ইউনুস আলী খান বিশেষ একজন মানুষ কারন তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী । আমরা জানি আওয়ামী রাজনীতির দুর্যোগকালে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশে অনেক মীরজাফরের জন্ম হয়েছিল, অনেকে দলছুট হয়েছিলো, কিন্তু ডাঃ ইউনুস আলী খান কিন্তু দলছুট হননি। একারনে তিনি চাকরীতে বৈষম্যমূলক আচরন ও হয়রানির স্বীকার হয়েছেন কিন্তু আদর্শচ্যুত হননি। ৭৫ পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসক এর নিপীড়ন এ যখন বাংলাদেশে আওয়ামীলীগের নাম নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিলো তখন তিনি জীবন এবং জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে রাজনীতি করেছেন এবং তৃনমুল পর্যায়ে আওয়ামীলীগকে সংঘটিত করেছেন, কর্মীদের সাহস দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সহায়তা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ এর উচ্চপর্যায়ের অনেক নেতা এসময় সুবিধালোভী হয়ে দল ছেড়েছে কিন্তু ডাঃ ইউনুস এর মত মানুষেরা দল ছেড়ে যান নাই । আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মের এই ইতিহাস জানা জরুরী, এইসব মানুষের মৃত্যুর পরও তাদের নিয়ে তাই আলোচনা হওয়া টা জরুরী। আমি শাহজাদপুর বঙ্গবন্ধু পরিষদ এর অনেকের সাথে কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন ডাঃ ইউনুস ছিলেন তাদের মাথার উপর ছাতার মত, তিনি

শাহজাদপুরে বঙ্গবন্ধু পরিষদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই সংগঠনের কার্যক্রম সুচারুরূপে চালিয়ে গেছেন। এমনকি তিনি পরিষদের সমস্ত আর্থিক খরচ একাই বহন করেছেন। বঙ্গবন্ধু পরিষদ ছিল তাঁর কাছে আরেকটি পরিবার। বঙ্গবন্ধু পরিষদ এর মাধ্যমেই শাহজাদপুরে ৭৫ পরবর্তী আওয়ামীলীগের রাজনীতি নতুন করে সংগঠিত হয়। আজকাল আমরা অনেককেই দেখি সুবিধা বাদী রাজনীতি করতে, কিন্তু ডাঃ ইউনুস আলী খান সুবিধার জন্য রাজনীতি করতেন না, বরং তিনি ব্যক্তিসুবিধা বিসর্জন দিয়ে জনমানুষের জন্য রাজনীতি করে গেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করে গেছেন। তাঁর তিন সন্তান আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার নিজেরও আমেরিকার গ্রীনকার্ড থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না , দুস্থ জনগনের সেবা করাই ছিলো তাঁর ধর্ম। আমি জেনেছি তিনি এমন একজন চিকিৎসক ছিলেন যিনি কোনদিন ভিজিট এর টাকা গুনে নেন নি , কেউ ভিজিট না দিলে কখনও ভিজিট চাইতেন না । গরীব রুগীদের ফ্রি চিকিৎসা থেকে শুরু করে ওষূদধপত্র দিয়ে দিতেন। একারনেই শাহজাদপুর এলাকায় তিনি পরিচিত ছিলেন "গরীবের ডাক্তার" হিসাবে। এর বাইরে দলের নেতা কর্মী এবং সমর্থক দের জন্য তাঁর চিকিৎসাসেবা ছিল অবারিত। ডাঃ ইউনুস তাঁর চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানাতেন এবং তাদেরকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে উদ্বুদ্ধ করতেন।মুক্তিযোদ্ধা এবং ছাত্রদের তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার অসাধারন ক্ষমতা এবং সকলের প্রতি অমায়িক আচরণ তাকে জনসাধারণের খুব আপন এক মানুষে পরিণত করে। সমাজের মানুষের মধ্যে মিশে থেকে তিনি সমাজের উন্নতিকল্পে জনসচেতনতা তৈরী করতেন। অসাধারন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং মানবিক একজন মানুষ ডাঃ ইউনুস ছিলেন সমাজের প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বাক্তিত্ব সকলের ভরসার জায়গা , যেকোনো ক্রান্তিকালে তিনি সকলকে সুপরামরশ দিয়ে তাদের পাশে থেকেছেন।। ডাঃ ইউনুস আলী খাঁন সাহেব শুধু ডাক্তারই ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী এবং সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ।। শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যখন ডঃ খালেক (সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডিয়াম সদস্য , বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি) স্যার প্রথম উত্থাপন করেন তখন শাহজাদপুর হতে ডাঃ ইউনুস আলী খান সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন তাকে ডঃ খালেক স্যারের সাথে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান। তার ছিলো সর্বজন গ্রহনযোগ্যতা এবং সকলকে নিয়ে কাজ করার মনোভাব, যার ফলে তিনি এ অন্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জনমত গঠন করেন এবং এতদঅঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও পরবর্তীতে এব্যাপারে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে আর তারই ফলশ্রুতিতে একটা উপজেলা পর্যায়ে আজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যেটা এখনও আমাদের কাছে বিস্ময় যে উপজেলা পর্যায়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে সম্ভব। এটা সম্ভব হয়েছে ডাঃ ইউনুস আলী খাঁনের

মতো দুরদর্শী, নিঃস্বার্থ সমাজ সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী মানুষের জন্য । আমার প্রত্যাশা থাকবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার প্রতিষ্ঠাকালীন এ কুশীলব কে ভুলে না যায় এবং স্থায়ী ক্যাম্পাস এ একটি ভবনের নাম ডাঃ ইউনুস আলী খানের নামে করে তাঁর অবদানকে স্মরনীয় করে রাখতে পারে। আমার বিশ্বাস শাহজাদপুরবাসীও তাদের প্রিয় ডাক্তার সাহেবএর স্মরণে আমার এই প্রস্তাব এর সাথে একমত হবেন। সর্বোপরি ডাঃ ইউনুস আলী খান তাঁর কর্মের মাধ্যমে আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মতিউর রহমান লাল্টু : যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটি। পরিচালক, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, জাতীয় কাউন্সিল।

একজন ভালো মানুষের প্রতিকৃতি

মো. আব্দুর রউফ

"নয়নসমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
হে বন্ধু! তোমার ইহধাম ত্যাগের পর এখন শুধু গুনগুন করুণ সুর অস্থির করছে তোমার লাখো ভক্তহৃদয়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরলস মানবসেবায় রত সদাহাস্যময় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ছিলেন রুচিশীল পোশাকে বিনয়ের আধার একজন নিপাট ভদ্রলোক। চেম্বারে পদার্পণমাত্র মিষ্টি হাসির অভ্যর্থনা মন কেড়েছে যে কারও। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ২০১০ সালে। সন্ধ্যার পর দ্বারিয়াপুর বাজারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল ক্লিনিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি প্রচুর রোগী তাঁর পরামর্শ লাভের জন্য অপেক্ষমান। একের পর এক রোগী তাঁর চেম্বারে ঢুকছেন আর বের হচ্ছেন। তাঁদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখগুলো দেখে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হতে লাগল। তখন আমি বসে ছিলাম তাঁদেরই জন্য বরাদ্দ একটি আসনে। অপেক্ষায় থাকলাম কখন রোগীর ভিড় একটু পাতলা হয়। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। এখানে উল্লেখ্য, শাহজাদপুর সরকারি কলেজে দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় শিক্ষকতা করে, ১৯৮৯ সালের অক্টোবরে বদলি হয়ে রাজশাহী কলেজে যোগদান করি। ১৯৯৭ সালে অবসরে যাই। এই অবসরকালীন সময়ে মাঝেমাঝেই শাহজাদপুর বেড়াতে যাই। তাই সে বারও সারাদিন গোটা শাহজাদপুর চষে বেড়িয়েছি প্রিয় মুখগুলো দেখার জন্য, কিছুস্মৃতিচারণ করার জন্য। শেষ পর্যন্ত এক ফাঁকে বিনা অনুমতিতে 'অনুপ্রবেশ' আমার। অতঃপর ভুবন ভোলানো আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। অতঃপর রোগী দেখা বন্ধ। কুশল বিনিময়ের পর আপ্যায়ন পর্ব।

এখানে তাঁর সঙ্গে আমার সখ্যের সূত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর মেজ মেয়ে মিতা ও আমার বড় মেয়ে অজন্তা স্কুলজীবন থেকে শুরু করে শাহজাদপুর সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই সূত্রে আমরা (আমি ও ডাঃ মোঃ ইউনুস) আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আরও একটি কাকতালীয় বিষয় হলো—আমাদের উভয়েরই কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে আমাদের দুই মেয়েই কানাডা প্রবাসী। আমি সস্ত্রীক ২০০৮ সালে ছয় মাসের জন্য যখন কানাডার ওন্টারিও প্রদেশের টরেন্টোতে যাই, তখন কানাডার আলবার্তা প্রদেশের ক্যালগারিতে মিতার সঙ্গে আমাদের ফোনে কথা হয়। সেই স্মৃতিচারণ করলাম ডাঃ খান

সাহেবের সঙ্গে। কথা যেন শেষ হয় না। কিন্তু আমি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম রোগীদের উঁকিঝুঁকিতে। না জানি কে কোন কষ্ট নিয়ে এসেছেন ডাক্তার দেখাতে, আর শুধু আমার উপস্থিতির কারণে চেম্বারে ঢুকতে পারছেন না। সে কারণে মনে অতৃপ্তি নিয়েই যথাশীঘ্র চেম্বার ত্যাগ করলাম। ডাঃ খান শুধু বীর মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন না, ছিলেন জীবনযোদ্ধা। মানবতা রক্ষার যোদ্ধা। অকুতোভয় এই যোদ্ধা তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন করোনার বিরুদ্ধেও। জীবনযোদ্ধা হিসেবে নিজেরসহ সহোদর ভাইয়ের সন্তানসন্ততির সার্বিক দেখভালের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বীর সৈনিক যেমন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনও পিছুহটেন না, তেমনি জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও, তিনি কর্তব্য-কর্ম থেকে দূরে থাকতে পারেননি। সারাদিন রোগী দেখার পরও সন্ধ্যাতেও তেমনি অমলিন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। মুখাবয়বে লেগে থাকত কর্তব্য- কর্ম সম্পাদনের পবিত্র তৃপ্তির আভা, সকালের মতোই সতেজ।

তিনি ছিলেন মৃদুভাষী। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সামাজিক, পারিবারিক ও নাগরিক দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত হার্দিক। তাঁর সৌজন্যবোধ যে কাউকেই মুগ্ধ করে। শুনেছি শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ স্থানীয় আন্দোলনেও তিনি ছিলেন এক অগ্রণী সেনা। ২০২০ সালের ২৪ জুন ২০২০ তিনি 'শহিদ' হন। হ্যাঁ, মহামারিতে কোনো মুসলমানের মৃত্যু হলে, ইসলাম ধর্মে তাঁকে 'শহিদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের 'গাজি' করোনাযুদ্ধে 'শহিদ' হলেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের 'গাজি' আবারও স্বাক্ষর রাখলেন করোনাযুদ্ধে।

আমার বিশ্বাস শাহজাদপুরের বর্তমান প্রজন্মের স্মৃতিতে তাঁর প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এখন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান শাহজাদপুরবাসীর নয়নজলে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার কথাই বলি না কেন! তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কদিনই-বা তাঁর কথা মনে পড়ত? অজন্তা-মিতার সঙ্গে কথা হলে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কথা স্মরণ হতো। কিন্তু এখন? তাঁর চিরবিদায়ের পর প্রতিদিনই তাঁর মুখাবয়ব আমার মনের সামনে হাজির হয়, অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় স্মৃতির পাতায় জেগে ওঠে। প্রায় প্রতি ওয়াক্তের নামাজের পর আল্লাহর কাছে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তিনি এখন বাসা বেঁধেছেন আমার চোখের জলে। আমাদের চোখের জলে। গানের বাণী দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবার হুমায়ূন আহমেদের গানের বাণী দিয়েই শেষ করতে চাই।

"যে থাকে আঁখি পল্লবে—
তার সাথে কেন দেখা হবে?
নয়নের জলে যার বাস
সে তো রবে নয়নে নয়নে"।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

আমার দেখা ডা. ইউনুস আলী খান (ডাক্তার কাকা)

মো. শামসুল আলম

করতোয়া নদী স্নাতো হযরত মখমদ শাহদৌলার পূণ্যভুমি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত আমাদের এই শাহজাদপুর। এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সাহিত্যরত্ন নজিবর রহমান, কথা সাহিত্যেক বরবকতুল্লাহ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবি বিশিষ্ট ফোকলরবিদ ড. মযহারুল ইসলাম সহ অনেক মনীষী। এই সকল মহাতারকাদের মাঝে ডা. ইউনুস আলী খাঁন ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত আলো ছড়াবে শাহজাদপুরের আকাশে চিরদিন।

১৯৮৭ ইং সালে ডাক্তার কাকার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল ছাত্রলীগের রাজনীতি করার সুবাদে। তার আগে ১৯৮৪ ইং সালে এস, এস, সি পাশ করে শাহজাদপুর কলেজে ভর্তি হলে প্রতিদিন ডাক্তার কাকার দ্বারিয়াপুরের চেম্বারের সামনে দিয়ে কলেজে যেতাম। সেই সময়েই দেখেছি, শত শত অসুস্থ মানুষ চেম্বারের ভীড় করত চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য। ঐ সময় থেকে আমাদের বাড়ীর কেউ অসুস্থ হলে আমার বাবা তাকে নিয়ে যেতেন ডাক্তার কাকার কাছে। বাবার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টতাও ছিল, তাই তাকে আমি কাকা বলে ডাকতাম। তখন আমার মা ছিল খুবই অসুস্থ প্রায়ই খুব খারাপ অবস্থা হয়ে পড়ত। ডাক্তার কাকার যদিও সময় হত না, তবুও সময় বের করে আমার মাকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসতেন কারণ আমার মা ডাক্তার কাকার চেম্বারে নেওয়ার অবস্থায় ছিল না, এভাবেই আমাদের পরিবারের সবার সাথে বিশেষ করে আমার ভাই-বোনদের সঙ্গে একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়। আমাদের সবারই মনে হতো ডাক্তার কাকা আমাদের অত্যন্ত আপনজন।

ডাক্তার কাকা সকাল ৮.০০ থেকে রাত্রি ৯-১০ টা পর্যন্ত রোগী দেখতেন বিরতহীন ভাবে, সম্ভবত কোন দিনই দুপুরে খাবার খেতেন না বা সময় পেতেন না। দূর দুরান্ত থেকে অসুস্থ মানুষেরা আসতো তাদের সু-চিকিৎসা দেওয়ার ব্রত নিয়ে নিশ্চিতে সেবা দিয়ে যেতেন।

ডাক্তার কাকার সংস্পর্শে আসার পর বুঝতে পেরেছিলাম কেন এত মানুষ এখানে ভীর করে, নিরহংকার, সদা সদালাপী, ডাক্তার কাকা রোগীদের সঙ্গে কথা বলতেন এমন ভাবে যেন প্রত্যেক রোগীই তার নিজ পরিবারের সদস্য। শুধু চিকিৎসা নয়, রোগীদের পরিবারের খোজ খবরও নিতেন। তার সাবলীল বাচন ভঙ্গি মানুষকে মুগ্ধ করত। অসুস্থ মানুষগুলো তার সান্নিধ্যে আসার পরেই যেন অর্ধেকটা সুস্থ্য হয়ে

যেতেন। তাইতো শুধু শাহজাদপুরে নয়, পার্শ্ববতী উপজেলা বেলকুচি, চৌহালি, উল্লাপাড়া, বেড়া, চাটমোহর, বনোয়ারী নগর ফরিদপুর সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ছুটে আসতো তাদের প্রিয় ইউনুস ডাক্তারের কাছে। আমি সুযোগ পেলেই চলে যেতাম ডাক্তার কাকার কাছে, চেম্বারের এক কোনে চুপ করে বসে থাকতাম কাকার কথা শোনার জন্য কিন্তু ফুরসরৎ কই কথা বলার, যখন একটু অবসর পেতেন তখনই কথা বলতেন আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে, সে কথায় পরে আসছি।

এত রোগীর ভীড় দেখে আমি ভাবতাম ডাক্তার কাকার অনেক উপার্জন। কিন্তু না, ডাক্তার কাকা অর্থ উর্পাজনের জন্য নয় মানব সেবার জন্য এই পেশা বেছে নিয়েছিলেন। বেশিরভাগ রোগীই দেখতেন ফ্রি তে। দরিদ্র রোগীদের সব সময়ই ফ্রি তে চিকিৎসা দিতেন। পরিচিত জনেরাও ফি দিতেন না, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের পরিচয়ে অনেক রোগী আসতো তাদেরও ফি নিতেন না। আমাকে বলতেন "শামসুল" যেভাবে হোক, যেখান থেকেই হোক, মানুষের সেবা করাটাই হলো দেশসেবা। তোমাদের রাজনীতি যেন মানব সেবার জন্য হয়।

ডাক্তার কাকার ওখানে গেলে আমাকে প্রায়ই একটা কাজ করতে হতো, সেটা হলো বয়স্ক আর দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাপত্র লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন আর বলতেন " যাওতো শামসুল উনাকে কিছু ঔষধ কিনে দিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে এসো।" এভাবেই একজন সাধারণ চিকিৎসক মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে গেল—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদের লোক।"

কবি এখানে তোমাদের বলতে সর্ব সাধারণের কথা বলেছেনে। ধনী, গরীব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কৃষক, শ্রমিক, ভাল, মন্দ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সর্বস্তরের মানুষের কথা বলেছেন। আমাদের দেশের নেতানেত্রী এমপি, মন্ত্রীদের বক্তৃতায় এই লাইন দুটি মাঝে মধ্যেই শোনা যায়। কিন্তু কবির ভাষায় "তোমাদের লোক" কেহ হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আমার বিবেচনায় ডাক্তার ইউনুস আলী খাঁন, বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তোমাদের লোক" হতে পেরেছিলেন। ডাক্তার ইউনুস আলী খাঁনই দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারেন—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদের লোক।"

আমি দেখিছে ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, সব শ্রেণির পেশার মানুষ আসতো তার কাছে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য। ডাক্তার কাকাও সব শ্রেণি পেশার মানুষকে ভালবাসতেন সমভাবে। তার আন্তরিকতায় সবাই নিজে নিজের মতো করে ভেবে নিত, ডাক্তার সাহেব বোধ হয় আমাকেই বেশি ভালোবাসেন, বেশি গুরুত্ব দেন। ডাঃ ইউনুস আলী খাঁন ছিলেন আজীবন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে

লালিত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের একজন মেধাবী ও বলিষ্ট সংগঠক। তিনি ছিলেন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ শাহজাদপুর উপজেলা শাখার আমৃত্যু সভাপতি এবং শাহজাদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য।

৭৫ এর পর সারা বাংলাদেশের মতো শাহজাদপুরেও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন নেমে আসে, আওয়ামীলীগ সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ডাক্তার কাকা সব সময় চেষ্টা করতেন কিভাবে শাহজাদপুরের আওয়ামীলীগকে সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী করা যায়, ১৯৮৭ইং সালে আমি, নুরুল আলম আনসারী আলম, বাদল, মোস্তাক, মহির, মোফা, ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে গিয়ে তার সংস্পর্শে আসি। তখন ছাত্রলীগ বা আওয়ামীলীগের রাজনীতি করা খুবই কঠিন ও কষ্টকর ছিল। সাংগঠনতো দুর্বল ছিলই সঙ্গে ছিল স্বৈরাচারের নির্যাতন। আমরা মিছিল মিটিং করতে গেলেই মামলা, হামলার, শিকার হতে হতো। তৎকালীন আওয়ামীলীগ নেতাদের তেমন টাকা পয়সা ছিল না, সক্রিয় নেতার সংখ্যাও কম ছিল।

দলের কর্মসুচি বাস্তবায়ন মামলা মোকদ্দমার খরচ বহন করা ছিল কঠিন। আমাদেরকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করতেন সারা শাহজাদপুরে দুই তিনজন বঙ্গবন্ধুর আর্দেশের মানুষ, তাদের মধ্যে ডাক্তার কাকা অন্যতম। তিনি ছিলেন খুবই কর্মী বান্ধব আর যেহেতু তাকে সব সময়ই কাছে (চেম্বারে) পাওয়া যেতো তাই সমস্যা হলেই আমরা ছুটে যেতাম তার কাছে। তিনি সব সময়ই আমাদেরকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করতেন।

ডাক্তার কাকার পরামর্শে আমি, আলম ভাই, বাদল, মোস্তাক, মহির, মোফা সহ আরও অনেকেই রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কবলিত আহত রক্তাক্ত মানুষকে কাকার চেম্বারে নিয়া আসতাম, তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের গুন্ডা বাহিনী কর্তৃক দলীয় নেতাকর্মীরা হামলার শিকার হয়ে আহত হলে, তাদেরও আমরা নিয়ে যেতাম ডাক্তার কাকার কাছে। এ সব মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব কাকা নিজ কাধে তুলে নিতেন, অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাদের চিকিৎসা করতেন।

আমরা যখনই ডাক্তার কাকার কাছে গিয়েছি অবসর থাকলেই কাকা আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন, সুপরামর্শ দিতেন। কিভাবে বঙ্গবন্ধু গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে সারা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, এ সব আমাদের বুঝাতেন।

৬৬ এর ছয় দফা, ৭৯ এর গণঅভ্যুত্থান ৭০ এর নির্বাচন, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে তথ্য ভিক্তিক আলোচনা করতেন। আমরা মনোযোগ সহকারে শুধু শুনতাম। শুধু আমাদের সঙ্গেই এসব আলোচনা করতেন তা নয়। তার কাছে যেসব রোগীরা আসতো, পরিচিতজনেরা আসতো, সব শ্রেণির পেশার মানুষের সঙ্গে সুযোগ পেলেই আলোচনা করতেন, কথা বলতেন। বঙ্গবন্ধুর আর্দশের কথা, আওয়ামীলীগের

কথা। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গেলে দেশের কেমন উন্নয়ন হবে, সমাজের কেমন পরিবর্তন হবে, সেসব কথা সাধারণ মানুষকে বলতেন। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গেলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন হবে, চিকিৎসা সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে যাবে শিক্ষার হার বেড়ে যাবে, কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে, দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ হবে, মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে, কৃষক তার প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সহজে পাবে, তাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। মানুষের জীবন-যাপনের মান উন্নয়ন হবে, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাঙ্গালির পাঁচটি মৌলিক অধিকার (অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান) বাস্তবায়ন হবে। এইসব কথা বলে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতেন আওয়ামীলীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন।

ডাক্তার কাকার সব কথাই বাস্তবায়ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই বাংলার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। আজকে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোড়গোড়ায়, কৃষকেরা খুব সহজেই কৃষি উপকরণ পাচ্ছে। যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে। কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের সন্তানেরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। সরকার তাদের জন্য বিনামূল্যে বই দিচ্ছে, উপবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার খরচ বহন করছে। রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে যার সুবিধা সারা দেশের মানুষ পাচ্ছে। আজকে কৃষক শ্রমিকের সন্তানেরাও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজেস্ট্রেটসহ সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

শাহজাদপুরে আওয়ামীলীগকে কীভাবে সংগঠিত করা যায়, দলের জনসমর্থন কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় ডাক্তার কাকা আমাদের সেই পরামর্শ দিতেন এবং নিজের সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতেন। দলের প্রতিটা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে গঠনমূলক বক্তৃতা দিয়ে আমাদের নির্দেশনা দিতেন। শাহজাদপুরের মৃতপ্রায় আওয়ামীলীগকে জাগ্রত করার জন্য ডাক্তার কাকার যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তাভাবনা থেকেই ১৯৮৯ইং সালে তৎকালীন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বীরমুক্তিযোদ্ধা গোলাম মওলা আজম ভাই ও জাফর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে অনেক চেষ্টা করে, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের একনিষ্ঠ সহচর, বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বিশিষ্ট শিল্পপতি ড. মযহারুল ইসলামকে শাহজাদপুরের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন।

ড. ইসলামকে শাহজাদপুর সরকারি কলেজ মাঠে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ইউনুস আলী খান। কাজটা ছিল খুবই দুঃসাহসীক। তৎকালীন স্বৈর শাসকের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল। তার সুফল শাহজাদপুর উপজেলা আওয়ামীলীগ ও শাহজাদপুরের মানুষ পেয়েছে। ড. ইসলাম শাহজাদপুরের আওয়ামী লীগের হাল ধরার পর থেকেই শাহজাদপুরের আওয়ামী লীগ সু-সংগঠিত হয়, সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয় ও

জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আওয়ামীলীগ এখন শাহজাদপুরে একক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের এই যে রাজনীতিতে বেড়ে উঠা তার পেছনে ডাক্তার কাকার অবদান অপরিসীম। তিনি শুধু একজন ডাক্তারই ছিলেন না আমাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক শিক্ষক। একজন শিক্ষকের মতো করে আমাদের রাজনীতি শিখিয়েছেন। ডাক্তার কাকা যেভাবে মানুষকে ভালবেসেছেন, সেবা দিয়েছেন তা জগৎ সংসারে বিরল। শাহজাদপুরের মানুষও তাকে ভালবাসেন মন প্রাণ দিয়ে, এখনও মানুষ চায়ের স্টলে, রাজনৈতিক আলোচনায় বিভিন্ন আড্ডায় ডাক্তার কাকাকে নিয়ে আলোচনা করে। এসব দেখে আমার মনে হয় ডাক্তার কাকা আজও আমাদের মাঝেই আছেন, তিনি যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন তা ভাবা যায় না।

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী যখন করোনা (কোভিট-১৯) নামক ভাইরাসের কালো ধাবায় আক্রান্ত, মানবজাতি ধ্বংসের সম্মুখিন। সারা পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের মৃত্যুর মিছিল। অন্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনার করালগ্রাসে বাংলার মানুষ মৃত্যু আতংকে তটস্থ। বাংলাদেশের নামী দামী চিকিৎকেরা প্রাণভয়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক, চেম্বার, ত্যাগ করে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিজ বাড়ীতে সুরক্ষায় অবস্থান করেছেন। তখন শাহজাদপুরের মানুষকে করোনা নামক ঘাতকের হাত থেকে বাচানোর জন্য ডাক্তার ইউনুস আলী খান প্রতিদিন নিজ চেম্বারে অবস্থান করে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করেছেন, সেবা করেছেন। করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে শত শত মানুষকে প্রাণে বাচিয়েছেন। করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় নিজেই কখন যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন তা বুঝতেই পারেননি। যখন বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেড়ি হয়ে গেছে। এই মহৎপ্রাণ মানুষটি সবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, ২৪শে জুন ২০২০ ইং তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে যান, নাফেরার দেশে। জগৎ সংসার, প্রিয়জন, তার প্রিয় শাহজাদপুরের মানুষদের ফেলে রেখে ঘুমিয়ে আছেন অন্ধকার কবরে।

বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত গীতিকার যিনি অনেক আগেই মারা গেছেন, তার লেখা একটি গানের প্রতিউত্তরে আমি লিখেছিলাম—

"সব ক'টা জানালা খুলতে বলেছো
সমাধির গায়ে কোনো জানালা নেই,
সেখানে থাকতে হবে না তোমায়
থাকবে মানুষের অন্তরে।"

ডাঃ ইউনুস আলী খান সমাধিতে নয় চিরকাল থাকবে মানুষের অন্তরে, যতদিন এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস, পাহাড় নদী, থাকবে, তত দিন মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবে সবার প্রিয় ইউনুস ডাক্তার, আমাদের ডাক্তার কাকা।

লেখক : মো. শামসুল আলম (সাবেক ছাত্রনেতা)।

আমার ডাক্তার

বাবুল আকতার খান

১৯৮৪ সাল। আমরা তখন সিরাজগঞ্জের মোক্তার পাড়ায় বসবাস করি। আমার বাবা জয়নুল আবেদীন খান একজন আইন ব্যবসায়ী। প্রাকটিস করেন সিরাজগঞ্জ কোর্টে। তখনকার এরশাদ সরকার বিচারিক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের কারণে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা কোর্ট স্থাপন করেন। সেই সুবাদেই আমার বাবা শাহজাদপুরে চলে আসেন। উদ্দেশ্য দুইটি--প্রথমত, শাহজাদপুর কোর্টে ওকালতি করা এবং দ্বিতীয়ত, গ্রামের বাড়ি শাহজাদপুরের অদূরে সাতবাড়ীয়ার জমিজমা দেখাশোনা করা। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, পরিবার-পরিজনসহ শাহজাদপুর স্থানান্তর হওয়ার। আমরা সবাই চলে এলাম শাহজাদপুরে। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। তখনকার সময়ের শাহজাদপুরে কিছুটা গ্রামীণ পরিবেশ ছিল। পাকা রাস্তাঘাট খুবই কম ছিল। দোকানপাটও খুব বেশি না এবং সাধারণ। পাকা দালানবিশিষ্ট দোকানপাট নাই বললেই চলে।

শাহজাদপুরে এসে আমরা ভাড়া বাসায় উঠি। সহপাঠীরা অল্পদিনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুহয়ে উঠল। শাহজাদপুরও ধীরে ধীরে প্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। একদিন ঠান্ডা লেগে আমার সর্দি-জ্বর হলো। আমরা ভাই-বোনেরা আমার বাবাকে 'আব্বা' বলে ডাকতাম। আব্বা আমাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য নিয়ে গেলেন। মনিরামপুর বাজারের মন্দিরের বিপরীতে একটি বড় টিনের ঘরে ওষুধের দোকান। দোকানের নাম 'সাথী মেডিকেল হল'।

দোকানের প্রায় মাঝামাঝিতে বড় একটি টেবিল সামনে রেখে একজন ডাক্তার বসা। ছিমছাম গড়ন। বয়স চল্লিশোর্ধ হবে মনে হলো। টেবিলের উপরে একটি নামফলক রাখা আছে। তাতে লেখা আছে—ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান, বিএসসি, এমবিবিএস (রাজ)। দোকানে দক্ষিণ পাশে লম্বা দুটি হেলনা বেঞ্চে রোগীরা বসে আছেন। ডাক্তার সাহেবের টেবিলের সামনে কয়েকটি চেয়ার রাখা আছে।

আব্বাকে দেখে ডাক্তার সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। বোঝা গেল, আব্বার সাথে ডাক্তার সাহেবের আগে থেকেই পরিচয় আছে। আব্বা চেয়ারে বসলেন। আর আমি বসলাম হেলনা বেঞ্চে। ডাক্তার সাহেবকে দেখে খুবই শান্ত ও ধীর—স্থির মনে হলো। বোঝা গেল, তাঁর টেবিলে রাখা তালিকা অনুযায়ী রোগী দেখছেন। ওনার এটেন্ডেন্ট আমার নামটাও তালিকায় লিখে দিলেন। তালিকার নাম অনুযায়ী আমাকে ডাকলেন ডাক্তার সাহেব। আমি গিয়ে বসলাম তাঁর পাশে রাখা একটি

কাঠের টুলের উপর। আমার জ্বর মাপলেন। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন। শেষে প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, 'ওষুধগুলো নিয়মমতো খাও, ঠিক হয়ে যাবে'। ডাক্তার সাহেবের ফি দিয়ে আব্বা আমাকে বাসায় নিয়ে আসলেন। এভাবেই আমি চিনেছিলাম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে। এরপর থেকে আমাদের বাসার কারও কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলে, আমরা ওনার কাছেই চলে যেতাম। যখনই যেতাম আমি তাঁকে 'কাকা' বলে সম্বোধন করতাম। দিনে দিনে তিনি আমাদের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। এ কারণে ওই সময়ে শাহজাদপুরে আর কোনো পাশের ডাক্তার ছিল কি না, তা খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন কখনও মনে হয় নাই।

১৯৮৫ সালের কথা। তখন আমি শাহজাদপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছি। স্কুলজীবনের বেশির ভাগ বন্ধুই একই কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার মধ্যে রনি, সজল, রাজ্জাক, ইকবাল, সাইফুল, রুবেল, বাদশাসহ আরো অনেকে। কলেজে এসে বন্ধুদের তালিকায় নতুন করে যুক্ত হলো লিপি, নীনা, নার্গিস, বিউটি, লতিফা, আফরোজা, বেলী ও রিতা। পরে জানতে পারলাম, বেলী ছিল ডাক্তার ইউনুস আলী কাকার ভাতিজি, আর রিতা হলো তাঁর বড় মেয়ে, যে এখন আমেরিকা প্রবাসী একজন প্রতিষ্ঠিত বড় ডাক্তার। বাবার যোগ্য উত্তরসূরি। রিতা খুবই বন্ধুবৎসল ছিল। বন্ধুদের আড্ডায় রিতা ছিল আমাদের মধ্যমণি। কলেজের পাঠ শেষ করে আমি ভর্তি হই পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার শুরু হলো নতুন সমস্যা। খাবার আগে বা পরে সব সময়ই অনবরত ঢেকুর উঠতে শুরু করল। খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার। আমি পাবনা থেকে বাড়িতে চলে আসি। দেখা করি ইউনুস কাকার সাথে। তিনি আমাকে দেখলেন এবং আমার সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ওষুধ লিখে দিলেন। অবশ্য সমস্যাটা দূর হতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে। মানে এই সমস্যাটা নিয়ে আমি অনেকবার ডাক্তার কাকার কাছে গিয়েছি। এ কারণে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরে আমি যখনই গিয়েছি, উনি আমাকে দেখেই একটুমুচকি হাসি দিতেন। আমাকে একদিন বললেন, 'এত ভয় পাও কেন? এটা এমন কোনো অসুখ না যার জন্য তুমি মারা যাবে।'

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমার আব্বা শাহজাদপুর কোর্টে ওকালতি করাকালীন প্রায় ৭০ বছর বয়সে প্রায়ই ব্রংকাইটিসের সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনিও ইউনুস কাকার নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ করে ওষুধ সেবন করতেন। যার কারণে তিনি দীর্ঘদিন সুস্থ ছিলেন। 'ইউনুস ডাক্তার' ছাড়া শাহজাদপুরে অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে তাঁকে কখনও যেতে দেখিনি। ইতিমধ্যে কাকার চেম্বার পরিবর্তন করেছেন দ্বারিয়াপুর বিসিক বাসস্ট্যান্ড রোড সংলগ্ন নিজস্ব জায়গায়। সেখানে কিছুদিন নিয়মিত রোগী দেখেন। এর পর সেখানে তিনি গড়ে তোলেন ডক্টরস ইবনেসিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড হাসপাতাল। এর মধ্যে শাহজাদপুরে রাস্তাঘাট, দোকাপাটের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। দুই একজন এমবিবিএস ডাক্তারও এসেছেন কিন্তু কেউই রোগীর সেবায় ডাঃ

মোঃ ইউনুস আলী খানকে অতিক্রম করতে পারেননি। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের প্রতি শাহজাদপুরের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত এতটাই মজবুত ছিল।

২০০৮ সালের কথা। আমেরিকা প্রবাসী আমার বড় ভাই খোকন ভাই আমার মাকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আমার মায়ের স্বাস্থ্যগত কিছুসমস্যার কারণে তাঁকে নিয়ে যাই ইউনুস কাকার চেম্বারে। মায়ের কিছুপরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে তিনি বললেন, ভালোই আছেন। একটুরসিকতা করে মাকে বললেন, 'যাচ্ছেন তো আমেরিকায় ছেলের কাছে একা, দেইখেন আমেরিকায় যেয়ে আবার হারাইয়া যাইয়েন না।' মা পরপর দুইবার একা আমেরিকা ভ্রমণ করে এলেন। কিন্তু ২০১৩ সালের প্রথম দিকে একদিন সকালে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পান। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছিলেন না। ইউনুস কাকাকে খবর দেয়া হলো। তিনি তাঁর হাসপাতালের পোর্টেবল এক্সরে মেশিন পাঠিয়ে এক্সরে করালেন। রিপোর্ট দেখে বললেন, কোমরের জয়েন্টে একটা বলের মতো হাড় থাকে, সেটা কিছুটা ফেটে গেছে। ঢাকায় নিয়ে অপারেশন করাতে হবে। তাঁর পরামর্শমতো মাকে ঢাকায় নিয়ে অপারেশন করানো হলো। তবে এর পরেও মা

দাঁড়াতে সক্ষম হন নাই। যতদিন বেঁচে ছিলেন হুইল চেয়ারেই ঘরের ভিতরে চলাফেরা করতেন। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান তাঁর কোনো সংকটাপন্ন রোগীকেই নিজের চিকিৎসার অধীনে রাখতে চাইতেন না। তিনি সব সময়ই পরামর্শ দিতেন এ রকম রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শাহজাদপুরের বাইরে নিয়ে যেতে। এতে করে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের চিকিৎসা সম্বন্ধে গভীর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে শাহজাদপুরের সর্বস্তরের জনসাধারণের মনে।

২০১২ সালে আমার একবার হার্ট-অ্যাটাক হয়। প্রাথমিক ডায়াগনসিস হওয়ার পরে ইউনুস কাকা আমাকে তাঁর হাসপালের বেডে দুই ঘণ্টা অক্সিজেন সাপোর্ট দেন। পরে তাঁর পরামর্শে ওই দিনই আমার ভাইয়েরা আমাকে এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায় এবং তাঁরা আমাকে ভর্তি করে। পাঁচ দিন চিকিৎসা দেয়ার পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। এভাবেই চলছিলাম। কিন্তু ডাক্তার কাকার কাছে আমাকে যেতেই হতো। মনের মধ্যে এক ধরনের ভয় ঢুকে গিয়েছিল। কোনো অসুবিধা মনে হলেই আমি ছুটে যেতাম তাঁর চেম্বারে। খুব যত্ন সহকারে প্রেসার মেপে বলতেন, সব তো ঠিকই আছে। মনে সাহস নিয়ে বাসায় আসতাম। অসুবিধা মনে হলে আমি প্রায়ই যেতাম কাকার চেম্বারে। কখনও গিয়ে শুনতাম, উনি আমেরিকায় চলে গেছেন মেয়ের কাছে। সেদিন মন খারাপ করে ফিরে আসতাম বাসায়। অন্য কোনো ডাক্তার দেখাইনি। কারণ, ইউনুস আলী কাকার ওপরে যে আস্থা-বিশ্বাস ছিল, শাহজাদপুরের অন্য কোনো ডাক্তারের ওপর সেটা ছিল না আমার। তিনি যখন বিদেশ থেকে ফিরে রোগী দেখা শুরু করেছেন, তখন গিয়েছি কাকার চেম্বারে। প্রেসার মাপতে মাপতে একটুআদুরে ধমকের সুরে বললেন, 'ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হইও না তো। ওষুধ খাওয়া কমায়ে দাও। আর শোন, ইউনুস ডাক্তার

তো সারাজীবন বেঁচে থাকবে না। সুতরাং সেইভাবে চলতে হবে।' ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। আমি আমার বুকের বাম পাশের দিকে একটুচিনচিনে ব্যথা নিয়ে সন্ধ্যার পরে কাকার চেম্বারে হাজির হলাম। আমি বললাম আমার অসুবিধার কথা। তিনি আমাকে বললেন, 'একটা ইসিজি করে দেখতে হবে। কাউন্টারে দুইশ টাকা জমা দাও।' আমি যথারীতি টাকা জমা দিলাম। ইসিজি রুমে গেলাম। একজন মহিলা টেকনিশিয়ান আমাকে বেডে শুইয়ে ইসিজির যন্ত্রপাতি লাগালেন। ইসিজি করা হয়ে গেল। রিপোর্ট নিয়ে উনি ডাক্তার কাকাকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। এসে আবার ইসিজি করলেন। আবার ডাক্তার কাকার কাছে গেলেন। আবার এসে ইসিজি করা শুরু করলেন। আমি বললাম, এতবার ইসিজি করছেন কেন? উনি আমাকে ধমকের সুরে বললেন, আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকেন তো। উনি রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার কাকাকে দেখালেন। পরে এসে বললেন, আসেন স্যার আপনাকে ডাকছেন। আমি গেলাম কাকার চেম্বারে। আমাকে বসতে বললেন। বসলাম। ডাক্তার কাকা বললেন, 'তোমার বুকে কি খুব অস্থিরতা অনুভব করছ?' আমি বললাম, 'না'। উনি বললেন, 'আমি তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়বে। সকালে উঠে ঢাকায় ভালো ডাক্তার দেখানোর জন্য চলে যেও।' আমি একটু নার্ভাস ফিল করা শুরু করলাম। বাসায় এসে আমার ভাইদের বললাম কাকার কথা। তাঁরা বলল, যেহেতুডাক্তার কাকা বাইরে নিয়ে যেতে বলেছেন তাহলে কাল কেন আজকে রাতেই এনায়েতপুর হাসপাতালে নিয়ে যাই। যে কথা সেই কাজ। তখনই গাড়ি ডেকে এনায়েতপুরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ইসিজি করে একই ফলাফল পেয়ে আমাকে ভর্তি করে নিল। তিন দিন চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিল। রোগীর প্রতি ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান এর দরদ, স্নেহ, আন্তরিকতা ও যত্ন আমাকে সত্যি মুগ্ধ করেছিল। ২০২০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচের বন্ধু সংগঠনের এক সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করব। সে লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। লেখকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আমরা তাঁদের লেখা জমা দেয়ার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করলাম। লেখকদের এই তালিকায় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা যথারীতি তাঁর কাছেও গিয়ে বললাম, কাকা আমাদের একটা লেখা দিতে হবে। বললেন, কবে দিতে হবে। বললাম আমাদের প্রেসে কাজ চলছে। আপনি যত তাড়াতাড়ি দিতে পারেন। বললেন, আগামী রবিবারে এসো। আমরা কাজের ব্যস্ততায় রবিবারে যেতে পারি নাই। পরের দিন আমি আর চঞ্চল গেলাম। কাকা বললেন, আমি তো কালকে নিয়ে এসেছিলাম। তোমরা আসো নাই। লেখাটা বাসায় নিয়ে রেখেছি। কালকে এসো। খুবই লজ্জিত হলাম। শত ব্যস্ততার মাঝে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর কাজ তিনি ঠিকই করেছেন। পরের দিন সকাল ১০টায় গেলাম। উনি তখনও চেম্বারে আসেননি। একটু অপেক্ষা করতেই তিনি রিকশা নিয়ে চেম্বারের সামনে হাজির। রিকশা থেকে নেমেই আমাদের দেখে তিনি তাঁর লেখাটি

পকেট থেকে বের করে দিলেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখাটি নিয়ে প্রেসে জমা দিলাম। কাকার এই লেখাটির শিরোনাম ছিল--'শেষ নিঃশ্বাসেও জয় বাংলা'। সম্ভবত এটাই ডাক্তার কাকার জীবনের সর্বশেষ লেখা।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে চীনে মহামারি করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাসের দেখা দিল। এ এক মারাত্মক ভাইরাস। আক্রান্ত রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে রোগটি দ্রুত ছড়াতে থাকে এবং প্রাণহানী ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে ভাইরাসটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চের ৮ তারিখে একজন রোগীর দেহে ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত হয়। স্বাস্থ্য-ঝুঁকির কারণে ১৮ মার্চ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় সারাদেশে অঘোষিত লকডাউন। ইতিমধ্যে অনেক চিকিৎসক রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। অনেকে ফোনের মাধ্যমে রোগীদের সেবা দিতে থাকেন। কিন্তু ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একদিনের জন্যও রোগী দেখা বাদ দেননি। করোনা ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে জেনেও তিনি দিনের পর দিন কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই, আগের মতো স্বাভাবিকভাবেই রোগীদের সেবা দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডাক্তার কাকার বড় মেয়ে রিতার কাছে থেকে শোনা, উনি যখন মেয়ের কাছে আমেরিকায় যেতেন কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার বাংলাদেশে ফেরত চলে আসার জন্য ছটফট করতেন। তিনি বলতেন, 'আমার কাছে কত রোগী এসে ফেরত চলে যাচ্ছে। তারা তো অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যায় না।' শাহজাদপুরের মানুষের কাছে তিনি যে কতটা আস্থাভাজন, বিশ্বাসী ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন, সেটা হয়তো নিজ দিব্যজ্ঞানে তিনি জানতে পেরেছিলেন।

২০২০ সালের ১০ জুন আমি ফেসবুক থেকে জানতে পারি, ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান করোনায় আক্রান্ত। বিষয়টি দেখার পরে আমি আমাদের বন্ধুও ডাক্তার কাকার ভাতিজি বেলীকে টেক্সট করলাম, কাকার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট কবে এসেছে? ও জানাল, আজকেই এসেছে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। তখন থেকেই দোয়া করতে থাকলাম, কাকা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।

২৪ জুন বন্ধুরাজ্জাক দুপুরের দিকে ফোন করল। বলল, ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের ব্যাপারে কিছুশুনেছ না কি? আমি বললাম, না। ও বলল, ডাক্তার কাকা আর নেই। শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠল। আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, তিনি আর নেই। মনে হলো, একজন দরদি চিকিৎসক তো নয় যেন একজন অভিভাবককে হারালাম। আমার কানে যেন বারবার বাজতে থাকে কাকার সেই কথাটি, 'ইউনুস ডাক্তার তো সারাজীবন বেঁচে থাকবে না'। আমি মনে মনে বলি, 'কাকা, আপনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন আমার, আমাদের শাহজাদপুরবাসীর হৃদয়ে।'

স্মৃতির জানালায় বার বার ফিরে আসি

কে এম আতিকুল ইসলাম

সালটা হবে সম্ভবত ১৯৭৩। শাহজাদপুর তখন অজপাড়াগাঁ না হলেও শহর বলা চলে না। আধুনিক জীবনের প্রায় কোনো কিছুই এখানে দৃশ্যমান ছিল না। সাপ্তাহিক দুটি হাটের কারণে কিছু লোক সমাগম হয়, তারপর সারা সপ্তাহ সুনসান নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবন। দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ শাহজাদপুর বাজারে পাওয়া গেলেও বিয়ে-শাদীর কেনাকাটার জন্য বড় শহরে যেতে হতো। একই অবস্থা ছিল চিকিৎসার বেলায়ও। পাশ করা ডাক্তার বলতে তেমন কেউ ছিল না। ১৯৭৩ সালে আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি। খুব আইসক্রিম খাওয়ার নেশা ছিল। আমাদের এলাহি ভাই সিরাজগঞ্জের তৃপ্তি কোম্পানির আইসক্রিম বিক্রি করতেন। আব্বা সাপ্তাহিক ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এক সপ্তাহে আমাদের আইসক্রিম খাওয়ার যে বিল হবে সেটা একবারে দিয়ে দিতেন। এভাবে প্রচুর আইসক্রিম খাওয়া হতো। ফলটাও হাতে হাতে পেলাম। প্রচণ্ড দাঁতের ব্যথায় দিশেহারা অবস্থা। তখন শাহজাদপুরে দাঁতের কোনো চিকিৎসা ছিল না। বাড়িতে জর্দা বানানোর উপকরণ মেনথল দেয়া হলো, কিন্তু ব্যথার কোনো উপশম নেই। সারারাত ব্যথায় কষ্ট পেলাম। সকালে মোহন কাকা আসলেন, অবস্থা দেখে বললেন পোতাজিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইউনুস আলী খান নামে একজন ডাক্তার এসেছেন, ওনাকে খবর দিতে হবে। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান রাতে আমাদের বাসায় আসলেন এবং আমার মুখের ভিতর ইনজেকশন দিয়ে দুটি দাঁত তুলে ফেললেন। আমি অবর্ণনীয় কষ্ট থেকে রেহাই পেলাম।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন শুরু হলো, যা আমৃত্যু বজায় ছিল। আমরা ভাই-বোনেরা তাঁকে 'কাকা' বলতাম। আব্বার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের বাসায় আসলে দীর্ঘ সময় গল্প করতেন। তিনি খুব সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন। একটা সাধারণ বাইসাইকেলে চড়ে রোগী দেখতে যেতেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি মটর সাইকেলে যাতায়াত শুরু করেন। রোগীদের কাছ থেকে কখনও ভিজিট চেয়ে নেননি, যে যা দিত, তাই হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। রাত-বিরাতে কখনওই তিনি রোগীর ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করতেন না।

আব্বার সব চিকিৎসা ডাক্তার কাকা করতেন, জটিল কিছুহলে ঢাকায় কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠাতেন। আব্বা শাহজাদপুরে এসে কাকাকে দেখানোর আগে ওষুধ খেতেন না। এ নিয়ম আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য ছিল। ডাক্তার কাকা

করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আগে ডিসেম্বর মাসে শাহজাদপুরের বাসায় আমার হঠাৎ বমি শুরু হয়। সারারাত বমি হওয়ায় সকালের দিকে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। আমার ছোট ভাই বাবুল আমাকে হেলিকপ্টারে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করে। কিন্তু আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন। কাকা এলেন, আমাকে স্যালাইন পুশ করলেন, আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। এটাই তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ। ১৯৭৩ সালে যে অধ্যায়ের শুরু ২০২০ সালে আকস্মিকভাবে তার যবনিকাপাত। আল্লাহপাকের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, তিনি যেন ডাক্তার ইউনুস আলী খানকে জান্নাতে উচ্চ আসন দান করেন।

স্মৃতির দুয়ার খুলে

বিধান চন্দ্র ঘোষ

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ছিলেন শাহজাদপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক, সর্বস্তরের মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, বিশাল হৃদয়ের মানুষ। তিনি পাবনার শেষ সীমান্ত চরতারাপুর ইউনিয়নের দুবলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সরকারি চাকরির সুবাধে তিনি শাহজাদপুরে চলে আসেন। মূলত চক্ষুচিকিৎসক হলেও সব ধরনের চিকিৎসাসেবা দিতেন। এক সময় সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই এলাকার মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় ৪ যুগ তাঁর চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন এই এলাকার মানুষ। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ধীরে ধীরে গণমানুষের ডাক্তার বা গরিবের ডাক্তার বলে খ্যাতি লাভ করেন। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আজীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী, স্থানীয় বঙ্গবন্ধুপরিষদের আজীবন সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা। অসংখ্য নেতা-কর্মীর আস্থাভাজন ও অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি। আজন্ম নির্লোভ, নিরহংকারী সদা হাস্যোজ্জ্বল ও ধর্মনিরপেক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এই অমায়িক লোকটিকে দলমত নির্বিশেষে এলাকার সবাই ভালোবাসত।

আশির দশকের শুরুতে ছাত্রলীগ করার সুবাধে তাঁর সঙ্গে আমার সান্নিধ্য। সংগঠনের কাজে তিনি সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং আর্থিক সহায়তা করেছেন। ৮০-এর দশকের শেষার্ধে শাহজাদপুরে বঙ্গবন্ধু পরিষদ প্রতিষ্ঠালগ্নে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তাঁর একান্ত আগ্রহে গোলাম মওলা (আজম ভাই) বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে এক সভা আহ্বান করেন। শাহজাদপুর সরকারি কলেজের ২২ নম্বর কক্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারীদের সভায়, তাঁকে সভাপতি ও গোলাম মওলাকে (আজম ভাই) সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধুপরিষদ, শাহজাদপুর শাখা গঠিত হয়। আমি সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পাই। এক সময় বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে শাহজাদপুরের দেশবরেণ্য কৃতি সন্তান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্ট সহচর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মযহারুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বিচারপতি কে এম সোবহানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করার জন্য ডাঃ খান আমার নাম প্রস্তাব করেন। অনুষ্ঠানের দিন জনাব চয়ন ইসলামের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন নিম্মাতুর ভাই (চয়ন ইসলামের ভাই)। বাঘাবাড়ি রেস্ট হাউজে অবস্থানরত বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ও ববীন্দ্রসংগীত শিল্পী লিলি ইসলামের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন চয়ন ভাই। সেদিন বিকেলে শাহজাদপুর

সরকারি কলেজের শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ডাঃ মোঃ ইউনুস খানের সভাপতিত্বে গোলাম মওলা (আজম) ভাইয়ের বক্তব্যের পর বিচারপতি কে এম সোবহান ও ডঃ মযহারুল ইসলাম সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপনা করি। আমাকে জাফর ভাই সহযোগিতা করেন। এটা আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচনাপর্ব শেষে শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় মুক্তিযুদ্ধ ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানটি আওয়ামী লীগের জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। পরবর্তী সময়ে চয়ন ইসলাম আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসেন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে ডাঃ খানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি পারিবারিক চিকিৎসায় ফোন করলেই তিনি চলে আসতেন। এক সময় চাকরির সুবাদে আমি শাহজাদপুরের বাইরে চলে আসি। আমার কর্মস্থল সুজানগর তাঁর গ্রামের বাড়ির পাশে বিভিন্ন সময়ে এবং দুবলিয়ার মানুষের খোঁজখবর নিতেন আমার কাছ থেকে।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী দুবলিয়ার পারিবারিক কবরস্থানে শায়িত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী, দুঃসময়ের রাজনৈতিক যোদ্ধা, সৎ, নির্লোভ, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে শাহজাদপুরের মানুষের কাছে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন।

ডাক্তার ইউনুস আলী খান : সাধারণ্যে অসাধারণ

অধ্যাপক এনামুল কবির

সালটা সম্ভবত ১৯৯৫। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের সাথে আমার পরিচয় এক আত্মীয়ের মাধ্যমে। এই আত্মীয়ের সাথে ডাক্তার সাহেবের ছিল পারিবারিক উষ্ণ সম্পর্ক। রোগ-শোক অথবা একান্ত পারিবারিক বিষয়ে তাঁদের নিবিড় একাগ্রতায় বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তাঁদের সম্পর্ক কতটা গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সেই সুবাদে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের সাথে আমারও একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে বা বাসায় অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁকে 'ভাই' বলে ডাকতাম। অল্প সময়েই সম্পর্কটা বেশ দৃঢ়তা পায়। মাঝেমধ্যেই সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে আলাপচারিতা জমে উঠত। এমনও হয়েছে, চেম্বারে অগুনতি রোগী। একের পর এক দেখে যাচ্ছেন, ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে আছি। রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে আমার সাথে কথা বলে যাচ্ছেন, আমার কথা শুনছেন। ডাক্তার ভাই তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমাখা মুখে রোগীদের শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞেস করছেন, আবার আমার সাথেও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছেন। কখনও রাজনৈতিক, কখনও-বা পারিবারিক অথবা আদর্শিক বিষয় উঠে আসছে। মৃদুভাষী ইউনুস ভাইয়ের যেন কোনো কিছুতেই ক্লান্তি নেই। লম্বা সময় কখন চলে যাচ্ছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই! আবার কোনো রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন না, তা-ও নয়। রোগীদের কোনো অভিযোগও নেই। মনে হয় তাঁরা এটা উপভোগ করছেন। সবাই এক অদ্ভুত মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন ডাক্তার ভাইয়ের জাদুকরী আচরণ আর মধুমাখা কথার মায়াজালে। মায়াজাল? হ্যাঁ, সত্যিই তাই! ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের অনুচ্চ স্বরের কথায় যে কেউ সহজেই মোহিত হয়ে পড়তেন।

ডাক্তারি পেশার মতো এত ব্যস্ত একটি কর্মের মধ্যেও তাঁর রাজনীতি সচেতনতা সত্যিই অবাক করার মতো। বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন আমৃত্যু। এ ছাড়াও শাহজাদপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে তাঁর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কখনও এড়িয়ে যাননি। যেকোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান থাকতেন অগ্রবর্তী দলে। লোভ-লালসার হাতছানি কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। পদ-পদবি ব্যবহার করে একটুফায়দা অর্জন করেছেন—এ রকম অপবাদ সম্ভবত তাঁর চরম শত্রুও দিতে পারবে

না। অবশ্য তাঁর কোনো শত্রু আদৌ ছিল কি না, তা আমার জানা নেই। সাধারণ জীবন যাপনে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান।

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। আমাদের দেশে কিছুচিকিৎসকের নামে গুরুতর অভিযোগ উঠে যে, তাঁরা রোগীদের সাথে যথেচ্ছ খারাপ আচরণ করেন। অর্থলিপ্সা সংক্রান্ত অভিযোগও শোনা যায়। এ দিক থেকে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে দেবতার আসনে বসানো যেতে পারে। রোগী দেখার জন্য তাঁর কোনো নির্ধারিত ফি ছিল না। ব্যবস্থাপত্র হাতে নিয়ে একজন রোগী ফি হিসেবে যা দিতেন, ইউনুস ভাই সেটা কখনও দেখে নিতেন না। চুপ করে পকেটে রেখে দিতেন। হোক তা দশ টাকা বা বিশ টাকা। আবার কেউ সম্মানী না দিলেও ইউনুস ভাই কখনও চেয়ে নিয়েছেন এ রকম কোনো ঘটনা অন্তত আমার জানা নেই। গরিবের চিকিৎসা তিনি বিনা পয়সায়ই করতেন। অসচ্ছল অনেককে ওষুধও দিয়ে দিতেন। এ কারণে তাঁকে কেউ কেউ 'গরিবের ডাক্তার' বলে অভিহিত করতেন।

চিকিৎসা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত একজন সত্যিকারের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান শাহজাদপুরের সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর মর্মন্তুদ প্রয়াণে শাহজাদপুরবাসী শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরও অগুনতি মানুষ একজন অতি আপনজনকে হারিয়েছেন।

ব্যক্তি ইউনুস আলী খান চলে গেলেও, তিনি দীর্ঘকাল রয়ে যাবেন সাধারণ মানুষের মানসপটে। তাঁর কর্মমুখর বর্ণাঢ্য জীবন আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবামূলক কাজ তাঁকে অমর করে রাখবে। তাঁর মহাপ্রয়াণে শাহজাদপুরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা হয়তো কোনোদিনই পূরণ হবে না। তারপরও কেউ না কেউ তাঁর আদর্শকে ধারণ করে মানবসেবায় এগিয়ে আসবেন—এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। পরিশেষে প্রয়াত ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের পরকালীন মঙ্গল কামনা করছি। শান্তিতে ঘুমান, ইউনুস ভাই।

ডা. ইউনুস আলী খান : একজন কবি

নজরুল ইসলাম

আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের একটি সংগঠন হচ্ছে 'বাংলাদেশি কালচারাল সেন্টার অব ফ্লোরিডা'। প্রায় এক দশক ধরে এই সংগঠন বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার এবং দেশ-বিদেশে মানবসেবায় কাজ করে আসছে। একটি পরিবারের মতোই এই সংগঠনের সদস্যরা একে অন্যের পরিপূরক। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এই পরিবারে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের পদার্পণ ছিল এক অনুপ্রেরণার বার্তা। উনি যখন আমাদের এই শহরে আসতেন, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো, আড্ডা আর গল্প হতো অনেক। আমাদের সঙ্গ তাঁকে আনন্দ দিত বুঝতাম। যখন উনি অনেক জমিয়ে গল্প করতেন আমাদের সাথে, তখন দেশ, দেশের মানুষ, মানুষের সমস্যা, আমাদের করণীয় কী—আরও কত কী যে উঠে আসত!

আমাদের এই প্রবাসজীবনে দেশীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে তিনি অনুপ্রেরণা দিতেন আর বলতেন, "আমি সমগ্র পৃথিবীজুড়ে এই সংগঠনের মতো এত আন্তরিক একটি গ্রুপ আর দেখি নাই"। এটা অনেক বড় মন্তব্য আর পথ চলার অনুপ্রেরণা ছিল আমাদের জন্য। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমার সহধর্মিনীকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একবার এখানে (আমেরিকায়) আমার স্ত্রী তাঁকে একটি শার্ট উপহার দিলেন (তা প্রায় বছর দুয়েক আগের কথা)। সামান্য উপহারটা পেয়ে উনি যেন একটা ছোট শিশু বনে গেলেন। আনন্দে আত্মহারা! আর শার্টটা গায়ে দিয়ে বললেন, "একদম ঠিকমতো হয়েছে"। আর মুখে তাঁর সেই প্রাণবন্ত হাসি, যে হাসি এখনও আমার চোখে ভাসে। নিষ্পাপ ওই হাসি শুধু বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। প্রায় প্রতি বছরই এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা বাংলা বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করি ফ্লোরিডায়। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলা হয়ে ওঠে। অনেক মানুষের সমাগম হয় এখানে। নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা বাংলায় বৈশাখী পত্রিকা প্রকাশ করে থাকি। পত্রিকার জন্য আমি সামান্য কাজকর্ম করে থাকি, সেই হিসেবে আমি একদিন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে একটি কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ জানাই। খুব সাহসের সাথে একদিন বলে ফেলি--"খালু, আপনি যদি একটা কবিতা লেখেন তো দারুণ হতো, আমরা আমাদের বাৎসরিক ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে দিতাম। কেন জানি মনে হয় খালু আপনি লেখালেখি করেন।" আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই পরিচিত বিনয়ের মুচকি হাসি। একটুও অবাক না হয়ে বললেন, "আমি সামান্য মানুষ, একটু আধটু লিখি মাঝেমধ্যে।" আমার ধারণা

ঠিক ছিল। আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই সেদিন, যে একজন একজন ডাক্তার মানে তিনি শুধুরোগী দেখবেন আর প্রেসক্রিপশন লিখবেন, এই তো দায়িত্ব শেষ। কিন্তু একজন ব্যস্ত চিকিৎসক যিনি প্রতিদিন মানুষের সেবায় ব্যস্ত, তিনি যে একজন বড় মাপের কবিও, আমি তা গর্বের সাথে বলতে চাই। ওনার লেখা কবিতাটা আমি হাতে পেয়ে ভীষণ অবাক হই, আবেগে আপ্লুত হয়ে নিজের মনেই আবৃত্তি করে ফেলি। অসাধারণ ছিল সেই কবিতাটি। বাংলা ১৪২৫ আমাদের বাৎসরিক বর্ষবরণ পত্রিকায় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের লেখা 'বৈশাখ' কবিতাটি ছাপা হয়। এরপর ২০২০, বাংলা ১৪২৭-এ আমাদের বাংলা বর্ষবরণ পত্রিকার কাজ খুব জোরোশোরে চলে এবং তা সময়মতো সমাপ্তও হয়, যেখানে এই কিংবদন্তির আরও একটা কবিতা 'মা' আমরা কবির কাছ থেকে সংগ্রহ করি। সম্পাদনা শেষে যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে, তখন মহামারি করোনা দুনিয়াজুড়ে সকল কর্মব্যস্ততাকে স্থবির করে দেয়, সেই সাথে স্থবির করে দেয় এই মহান সেবক, মহান কবির জীবন! কবি নিশ্চয়ই জেনে থাকবে (যেখানেই থাকুক) তাঁর এই মরণোত্তর কবিতাটি একদিন ছাপা হবে আমাদের এই বাংলা পত্রিকায়।

আজ এই অপ্রকাশিত কবিতাটি আমাকে তাঁর কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটুকুলিখতেই আমার চোখ ভিজে আসছে, আমার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছে। আমার কাছে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একজন 'কবি'। এটি কোনো গল্প নয়, নয় কোনো কল্পনা। এ আমার অবাক হওয়া মনের কথা যে একজন মানুষকে আমরা কতটুকুই-বা জানতে পারি এক জীবনে! 'উনি একজন ডাক্তার', না 'উনি একজন কবি'? যাঁর চিকিৎসাসেবা যেমন তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে, 'গরিবের ডাক্তার' এর স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনি তাঁর লেখা কবিতা যেন তাঁকে আকাশের মতো প্রসারতি করেছে আমাদের কাছে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি এই কবিকে 'কবি' হিসাবে সম্বোধন করতে চাই, আর বলে দিতে চাই তাঁর লেখা কবিতা পড়তে চাইলে বিনা দ্বিধায় যোগাযোগ করবেন। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের এই কবিতাগুলো আমরা আমাদের এই প্রবাসজীবনে সংকলিত করে রাখব আমাদের এই ম্যাগজিনে।

সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শহিদের মর্যাদায় রাখুক সর্বোচ্চ সন্মানে আর আমাদের হৃদয়ে থাকুক আজীবন।

লেখক : আমেরিকা প্রবাসী। (নোট : আমেরিকা প্রবাসী মূল পরিচয় নয়।)

ডা. ইউনুস কাকার স্মরণে

রাম চন্দ্র সাহা মিলন

প্রয়াত ডাক্তার ইউনুস আলী খান একজন সম্মুখ সারির মুক্তিযোদ্ধা, জনদরদি, সমাজসেবক এবং 'গরিবের ডাক্তার' হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুপরিষদ, শাহজাদপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাহাপাড়ায় গিরিশ কর্মকারের বাড়ি ক্রয় করা এবং জনপ্রতিনিধি হওয়ায় আমার পিতা স্বর্গীয় অনিল কুমার সাহার সাথে তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাকা বাবুর শ্যালক মিলু আর আমি এক সাথে ডিগ্রি পাশ করেছি আমার বোনদের সাথে কাকার ভাতিজি বেলি, নাদিরা, ভাতিজা হেলালের সাথে বন্ধুত্ব এবং ছাত্র রাজনীতির বদৌলতে তাঁর সাথে আমারও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৮০-এর দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

জন্মভূমি পাবনা হলেও তিনি চাকরিসূত্রে শাহজাদপুরে আসেন। শাহজাদপুরে স্বাস্থ্য কর্মকতা হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন। শাহজাদপুরবাসীর প্রতি তাঁর এতই ভালোবাসা ছিল যে, প্রশাসন তাঁকে শাহজাদপুর থেকে বদলি করার আদেশ দিলে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। তিনি আমৃত্যু শাহজাদপুরবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একাধারে একজন চক্ষু চিকিৎসক, সাধারণ রোগের চিকিৎসক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার যোগ্যতা আমার নেই বললেই চলে। তিনি এতই দায়িত্বশীল ও মানবপ্রেমী ছিলেন যে করোনা মহামারিকে উপেক্ষা করেও সাধারণ মানুষের সেবা থেকে পিছপা হননি। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও আমার মা অসুস্থ হয়ে গেলে, তিনি তাঁকে সেবা দিতে এসেছেন। আমার বাবা বেঁচে থাকাকালীন তিনি সর্বদাই তাঁর সেবা করেছেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার মাকেও সেবা দিয়ে গেছেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত টেলিফোনেও তিনি সেবা প্রদান করেছেন নিরন্তর।

শাহজাদপুরবাসী শতশত বছর বিনম্র চিত্তে ডাক্তার কাকাকে স্মরণ করবে। সকল ব্যস্ততার মাঝেও তিনি শাহজাদপুরবাসীর সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্বে সমাধান দিতে এসেছেন এবং সুখে-দুঃখে সকলের পাশে থেকেছেন। তিনি এতই দয়াশীল ও দায়িত্ববান ছিলেন যে, নিজের শহিদ ভাইয়ের পরিবারের দায়িত্ব হাসিমুখে নিজের কাঁধে

তুলে নিয়েছিলেন। আমরা শাহজাদপুরবাসী আমাদের মাঝে তাঁর মতো একজন হৃদয়বান ব্যক্তিকে পেয়ে গর্ব বোধ করি। এমন একজন মানুষকে হারিয়ে আমরা মর্মাহত। তবে তিনি আজীবন বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। অমর হয়ে থাকবেন আমাদের ভালোবাসায়।

বিজ্ঞানের আলো হাতে ডা. ইউনুস আলী খান

রনি (নোট : পুরো নাম লেখা দরকার)

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় মূল সড়কটা বাদ দিলে শাহজাদপুরের প্রায় সমস্ত পথ-ঘাটই ছিল কাঁচা, যাকে বলে মেঠো পথ। সেই পথের দুই ধার দিয়ে বেয়াড়া প্রকৃতির ঘাস, জঙ্গল, আগাছার বন, যা কিছুদূর পর পরই সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে রাস্তার মাঝখান দিয়ে আইল্যান্ডের মতো অবস্থান নিয়ে থাকত, আর পায়ে চলা মানুষ অভ্যাসবসত দুই পাশের সরু হয়ে যাওয়া মেঠোপথেই চলাচলের সীমানা বেঁধে চলতেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলতে তখনকার এই মফস্বল শহরের মূল সড়কের ধার দিয়ে গুটিকতক অবাক করা বৈদ্যুতিক লাল আলো, থানা কাউন্সিলের সাদাকালো একমাত্র টেলিভিশন আর হাফিজের গ্যারেজের গোটা দুয়েক ব্রিটিশ আমলের বাস, বাকি সবই প্রকৃতি সদৃশ্য বহু পুরনো বসতির অবকাঠামো।

ঠিক এই সময়টাতে এই জনপদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন পাশ করা ডাক্তার হলেন আমাদের ইউনুস ডাক্তার। কিছুটা বিজ্ঞানমনস্ক ছিলাম বলে, থানা কাউন্সিলের ওই সাদাকালো টিভির মতোই অবাক বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতাম! এই আমার তাঁকে চেনার শুরু। এর পর যমুনার জল গড়িয়ে চলার মতোই-- জীবন বহমান! তারই ফাঁকে ফাঁকে ফাল্গুনে সবুজ শাখায় কচি পাতার জন্মোৎসব, অক্টোবরের বিকেলে ঝরা পাতার কান্নার শব্দ, আর বিজ্ঞানের ৩৬০ ডিগ্রি কোণে সর্বদিকব্যাপী ছুটে চলা--জীবনের সঙ্গী ও সত্য হয়ে চলছিল। কোনো মানুষের জন্যই পৃথিবী চিরকালের নয়, এটাই সত্য যে--মানুষ একসময় ঠিকই চলে যাবে তার অজানা গন্তব্যে! কিন্তু ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের এই সময়টায় এই ভাবে চলে যাওয়াটা, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুবই বিস্ময়ের! যাঁকে আমার জীবন শুরুর ওই ছোট্ট পরিসরে বিজ্ঞানের আইডল বলে ভাবতাম, সেই তাঁকেই আজ চলে যেতে দেখলাম পৃথিবীব্যাপী ভাইরাসে--বিজ্ঞানের এই চরম পরাজয়ের দিনে! অনেকটা তারই কারণ হয়ে! জানি মানুষ এ পরাজয় মেনে নেবে না, মানুষ আবার জেগে উঠবে আবার প্রকৃতির প্রভুত্ব করবে, অন্ধকার সরাবে, বিজ্ঞানের আলো জ্বালাবে। যেমন করে আমাদের প্রিয় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই জনপদে বিজ্ঞানের আলো হাতে নিরলসভাবে শত-সহস্র মানুষকে জীবনের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর এই পথ চলা ছিল গতানুগতিকের মধ্যে অভিনব, ইউনিক! তাই তো তাঁর সাধারণের মধ্যে অসাধারণ আনন্দ যাত্রা!

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাইফুল মাস্টার

পাবনা-সিরাজগঞ্জের আলোকিত বাতিঘর, 'গরিবের ডাক্তার' বলে খ্যাত বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতিতে ছিলেন মধ্যমণি। সর্বোপরি মানুষভজন ছিল তাঁর আরাধ্য। এত বড় একজন ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মিশতেন আত্মার আত্মীয় হয়ে। পৃথিবী, দেশ, সমাজ, মানুষকে নিয়ে কথা বলতেন, যেন সাক্ষাৎ একজন তাত্ত্বিক দার্শনিক। মোট কথা, তিনি ছিলেন একজন মানবপ্রেমিক মানুষ। সেই পরম শ্রদ্ধেয় কাকা মরহুম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সম্পর্কে এভাবে স্মৃতিচারণ করতে হবে ভাবিনি! ছোটোবেলায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি, শুনেছি কাকার যশ-খ্যাতির কথা। ডাক্তার বলতে তিনি একাই মানুষের সেবা দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর কর্মের গুণেই সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। হালে দু-চারজন নবাগত এসেছেন, কিন্তু তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা আর মানুষের ভালোবাসার কাছে নগণ্য। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কত মানুষকে যে বিনামূল্যে ওষুধসহ চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন, তা বলাই ভার। আমি আমার বাবার সাথে কখনও রোগী হয়ে, আবার কখনও রোগী নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। খুব কাছ থেকে তাঁর অমায়িক আচরণ অবলোকন করেছি। তাঁর ছোট মেয়ে আমার বান্ধবী হওয়ার সুবাদেও তাঁকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। কিন্তু ওইভাবে তিনি আমাকে চিনতেন না। যাতায়াতের সুবাদে আমার অল্প শিক্ষিত বাবাকে চিনতেন। মেয়ের সাথে বন্ধুত্বের খাতিরে যদিও তাঁর বাসায় গিয়েছি, কিন্তু সেটা বাল্যকালে।

যাই হোক, একটি কথা, একটি আচরণ এবং ভালোবাসার কথা না বলে পারছি না। যদিও আমার এই মনের কথাগুলো আমি মৌখিকভাবে আগেও ব্যক্ত করেছি। তার পরও মন মানছে না, তাই আজ লিখছি। ২০১৮ সালের ২০ অক্টোবর আমার বাবা স্ট্রোক করলে, আমি আমার বাবাকে কাকার কাছে নিয়ে যাই এবং কাকা যথাযথ চিকিৎসা করেন, কিন্তু আমার বাবার শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় আমি কাকাকে তাঁর মেয়ের পরিচয় দিলে কাকা আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং দ্রুত ঢাকা নেয়ার পরামর্শ দেন। সেদিন কাকার চোখের কোণে আমি পানি দেখেছিলাম। তখনই ভেবেছিলাম আমাদের ভাগ্যে কী হতে যাচ্ছে। হলোও তাই। ২৩ অক্টোবর আমার বাবা আমাদেরকে এতিম করে চলে গেলেন। যতদিন বেঁচে থাকব কাকার স্মৃতি কখনও ভুলব না।

২৪ জুন ২০২০, শাহজাদপুরের আকাশ থেকে খসে পড়ল সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, মানবতার মহান কাণ্ডারি, যাঁকে পাবনা-সিরাজগঞ্জের মানুষ কায়মনোবাক্যে 'গরিবের ডাক্তার' নামে চেনে-জানে। অপূরণীয় ক্ষতি হলো শাহজাদপুরবাসীর। তার পরও বিধির বিধান না যায় খণ্ডন। মহান রাব্বুল আলামীন পরপারে পরম শ্রদ্ধেয় কাকাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক কঠিন এই শোক সইবার শক্তি দান করুন। আমিন, ছুম্মাআমিন।

ডা. ইউনুস : মৃত্যুঞ্জয়ী যে মানুষ

শাহাব আহমেদ

পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ আছে : এক--যাঁরা নিজের জন্য বাঁচে, দুই--যাঁরা নিজের ও অন্যের জন্য বাঁচে। তিন--যাঁরা অন্যের জন্য বাঁচে। তৃতীয় গ্রুপের মানুষ সন্তের মতো। তাঁদের সংখ্যা খুব কম। জীবনের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে আমি এমন কিছুমানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম, যাঁরা নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে মানুষের জন্য বেঁচেছেন। আমি তাঁদের মতো হতে পারিনি। মোহের মায়াজালে ধরা পড়ে, সে জাল ছিঁড়তে পারিনি।

প্রথম গ্রুপের লোকজন সংখ্যায় কম নয়। তাঁরা কথায়, কাজে, মননে, বিশ্রামে তাঁদের ভেতরের আমিটাকে বেলুনের মতো ফুলায়। তাঁদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কখনই স্বীকার করে না যে এই রোগটা তাঁদের আছে। তৃতীয় গ্রুপের মানুষ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাঁদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা নিজের জন্য বাঁচে, কিন্তু তাঁর প্রতিবেশীর কথাটা ভোলে না। এঁদের মধ্যে কিছুমানুষ আছে চুম্বকের মতো, অন্যকে কাছে টেনে নেয় সহজেই।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ছিলেন এমন একজন মানুষ, সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ। তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে মাত্র কয়েক বার। কিন্তু প্রতিটা সাক্ষাতে তিনি ছিলেন আপনজনের মতো কাছের। তাঁর সাথে কথা বলে অনুধাবন করেছি যে, তাঁর চিন্তা-চেতনা ও মনন খুব স্বচ্ছ ছিল। দেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত তীব্র এবং সকল বাধা-বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা ও আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল। তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে শাহজাদপুরে তিনি বঙ্গবন্ধুপরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। মানুষের সেবা করার পেশা। সারা জীবন তিনি গ্রামে ডাক্তারি করেছেন, যদিও শহরে নগদ প্রাপ্তি বেশি। যখন তার সন্তানের বয়সী সদ্য পাশ করা ডাক্তারেরা তাঁরই চেম্বারের অদূরে বসে খুব উচ্চ ভিজিট নেওয়া শুরু করেন, তখনও তিনি মান্ধাতার আমল থেকে নাম মাত্র যে ভিজিট নিয়ে এসেছেন তাই বলবৎ রেখেছেন। বহু দরিদ্র রোগীর তা-ও পরিশোধ করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাই বলে তাঁরা চিকিৎসা থেকে

বঞ্চিত হননি। এমনকি নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কখনও কখনও রোগীর ওষুধ কিনে দিয়েছেন। তিনি ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসাসেবা দিতেন।

তাঁর চেম্বারে যেমন, তেমনি তাঁর আন্ধারকোঠা পাড়াস্থ নিজের বাসায় রোগীর ভিড় লেগেই ছিল। তিনি বিরামহীনভাবে রোগী দেখতেন। এ দিক থেকে নতুন প্রজন্মের অনেক ডাক্তারের থেকে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন। যখন করোনা ভাইরাসের ভয়ে ভীত হয়ে বহু ডাক্তার সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়ান, তখন তিনি তাঁর চেম্বার খোলা রাখেন। ৭৬ বছর বয়স, জানতেন যে এ বয়সে করোনা ভাইরাসের পরিণতি খুব সিরিয়াস। কিন্তু তিনি অবিচল কাজ করে গেছেন। কেন? টাকার জন্য? না, টাকা তিনি যথেষ্ট অর্জন করেছেন। তাঁর তিন মেয়ে উত্তর আমেরিকায় সফল জীবন যাপন করছে, তাঁদের পিতার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। নিজের পেশা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেয়নি। কিন্তু তিনি করোনার মৃত্যু-ছোবল এড়াতে ব্যর্থ হন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার ইমপালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে ২৪ জুন সকাল ১১টার দিকে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু তিনি মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবেন দীর্ঘদিন। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

স্মৃতির পাতা থেকে

শারমিন আক্তার

ডাঃ ইউনুস খালুর কথা বলতে গেলে, প্রথমে ভেসে ওঠে তাঁর হাসিমাখা মুখ। তিনি সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। খুব কম সময়ে তাঁর সাথে পরিচয়, কিন্তু কথা বললে সেটা মনেই হতো না। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সবার সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল একই রকমের। মনে পড়ে খালু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায় আমাদের বাড়ি; উত্তরে বলেছিলাম--বরিশাল। শুনেই তিনি বরিশাল সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন, যা শুনে খুব ভালো লাগল।

তাঁর মৃত্যুর পর জানতে পারলাম তিনি কতটা মহৎ, ত্যাগী ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা পড়ে জানতে পেরেছি, তিনি কতটা অসাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাক্ষাতে কোনোদিন বুঝতে পারিনি। হয়তো সেটা তাঁর বিনয়ী আচরণের কারণে। তিনি একজন বীর মুক্তিযাদ্ধা ছিলেন। তাই হয়তো এই বয়সেও এসে মহামারি করোনা ভাইরাসকে ভয় পাননি। তিনি করোনার বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে নেমে তাঁর এলাকার জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেলেন। এক কথায় বলতে গেলে তিনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

ডাঃ ইউনুস আলী খান : মানবতার সেবায় একটি লাইট হাউস

অজন্তা চৌধুরী

এই পৃথিবীতে কিছুমানুষ তাঁদের নামটি বিশেষণে রূপান্তরিত করেন। শাহজাদপুরে ডাঃ ইউনুস আলী খান শুধু একটি নাম নয়, একটি বিশেষণ। নিজের জীবন উৎসর্গ করে মানুষের সেবা করার নাম ডাঃ ইউনুস আলী খান। আর এ কারণেই শাহজাদপুরের মানুষ এই আত্মনিবেদিত মহৎ প্রাণ মানুষটির অভাববোধ করবে সবসময়। চিকিৎসা পেশাটি একটি মহৎ পেশা। কিন্তু নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিয়ে এমনভাবে সময় দিতে আমি খুব কম ডাক্তারকে দেখেছি।

পারিবারিকভাবে ডাঃ ইউনুসের মেজো মেয়ে মিতা আমার ঘনিষ্ট বান্ধবী সেই ক্লাস থ্রি বা ফোর থেকে। তাই মিতার সঙ্গে বাসায় যাতায়াতের সুবাদে এই মানুষটিকে ভালোভাবে চেনার সুযোগ হয়েছিল। সারাটা জীবন নিজের পরিবারের সকলের জন্য শুধু করেই গেছেন। তাঁর ভাই-বোনের বাচ্চারা কে কোথায় পড়বে, তাদের যে কোনোরকম সাহায্য তিনি করে গেছেন সারাটা জীবন তাঁর পরিবারের জন্য। এ তো গেল পরিবারের একজন আত্মনিবেদিত প্রাণ মানুষের কথা।

পরিবারের পাশাপাশি এই আলোকিত মানুষটি রাত-দিন অসুস্থ মানুষকে সেবা দিয়ে গেছেন। আমি স্কুলে যাওয়ার সময় তাঁর ডিসপেনসারি দেখতাম, মানুষের উপচে পড়া ভিড়। বাইরে পর্যন্ত মানুষ লাইন দিয়ে থাকত রাস্তায় এসে লাইন শেষ হতো। এখনও মনে পড়ে একদিন ডিস্পেন্সারির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক অসুস্থ মানুষ বলছিল-- উপরে আল্লাহ নিচে ইউনুস ডাক্তার, আমি ভয় পাই না। মানুষের এই আস্থা বা বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন সেবা দিয়ে।

আমার সাথে তাঁর শেষ কথা হয় .....সালে (নোট : কত সালে?)। আমি তখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি। তিনি শুনেই ভেঙে পড়েন এবং আমেরিকা থেকে আমাকে ফোন করেন। কত যে আশ্বাস দেন, আশার বাণী শোনান। কিন্তু বুঝতে পারিনি সেটাই ছিল শেষ বারের মতো কথা বলা। কথা ছিল পরবর্তী সময়ে তিনি টরেন্টোতে আমার সাথে দেখা করবেন। তা আর হলো না!

এই পৃথিবীতে এই স্বল্পকালীন সময়ে কিছুমানুষ শুধুমানুষকে দেয়ার জন্যই জন্ম নেন, তিনি তেমনই একজন। আমাদের মাঝে তাঁর অভাববোধ কোনোদিন ঘুচবে না। লাখ লাখ মানুষকে কাঁদিয়ে তিনি বিজয়ীর মুকুট পরে শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। করোনার ভয়াবহতা তাঁকে দমাতে পারেনি পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে। তাই

করোনাকালেও সেবা দিয়েই তিনি হাসি মুখে না ফেরার দেশে চলে গেলেন আমাদের কাঁদিয়ে। শাহজাদপুর যত দিন থাকবে ইউনুস ডাক্তারের নামও ততদিন থাকবে। এই প্রাপ্তি কয়জনের ভাগ্যে জোটে? আমরা আপনাকে সেরা চিকিৎসাটি দিয়ে ধরে রাখতে পারলাম না, সে ব্যর্থতা আমাদের। আপনি ভালো থাকুন, শান্তিতে ঘুমান ইউনুস চাচা। আপনি শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে না থাকলেও, স্মৃতিতে অম্লান।

সূর্য অথবা একটি সবুজ বৃক্ষের কথা

তানজির খান

বহুদিন ধরে আলো দিয়ে যাওয়া একটি সূর্য যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গেল প্রকৃতির নিয়মে। নিজেকে পুড়িয়ে মানবকল্যাণে ব্রত ছিলেন অক্লান্ত এক প্রাণ, তাঁকে তো সূর্যের উপমাতেই সবচেয়ে বেশি মানায়। আবার যদি বলি বিশাল বৃক্ষ তবুও মানানসই হয়! কত পাখি বাসা বাঁধল, কত মানুষ পাখির মতো ফল-ফুল ঠুকরে খেয়ে প্রাণে বাঁচল, কত পথিক তারই ছায়ায় বিশ্রাম নিল, কতবার ঝড় হাওয়ার বিপরীতে এই বিশাল বৃক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলল--মানুষ বাঁচল। আমি বলছিলাম আমার চাচা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের কথা, যিনি ছিলেন সত্যিকারের এক মহৎপ্রাণ, এক আলোকবর্তিকা, এক নতুন যুগ সূচনাকারী, ফুল-ফল দেয়া বিশাল বৃক্ষ এবং একজন দিবাকর।

তাঁকে নিয়ে লিখতে যাওয়া যে কারও জন্য সত্যি দুঃসাহসিকতা। একজন মানুষ কতটা বড় হতে পারে নিজ কর্মে, তা তাঁকে না জানলে কেউ বুঝবে না। তাঁর পেশাগত জীবনে একনিষ্ঠতা, সততা ও সাফল্য ছিল শতভাগ। ভালোবাসার চাদরে যিনি ঢেকে রাখতেন মানুষকে।

আমার ভালো লাগে, আনন্দ বোধ করি এই ভেবে যে তাঁর ভালোবাসা আমিও পেয়েছিলাম। মনে পড়ে যায় ছোট্টবেলার কথা। রিকশায় আম্মার কোলে উঠে যখন কাকার চেম্বারে যেতাম চেক-আপ করাতে, সেই সময়ের কথা। চেক-আপ শেষে চলে আসার সময় কাকা আমাকে কাছে নিয়ে আদর করে টাকা দিতে চাইতেন, আমি নিতে চাইতাম না। কাকা আম্মাকে বলতেন, তুমি না বললে ও নেবে না, ওকে নিতে বলো। আর আমাকে বলতেন, ভালো করে লেখাপড়া করো।

আমার মনে পড়ে, যখন ক্লাস সিক্স অথবা সেভেনে পড়তাম, খুব সম্ভবত ৯৮-৯৯ সালে কাকার মেজো মেয়ের বিয়েতে যাই। আপার বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেক রকম মজার ইভেন্ট করা হয়। যার একটিতে অংশগ্রহণ করে আমি সোনার লকেট জাতীয় কিছুপাই। সেদিন প্রোগ্রাম শেষে কাকা আমাকে ডেকে পাশে বসিয়ে অনেক আদর করেন। স্পষ্ট মনে আছে, নার্ভাসনেস কাজ করছিল তখন আমার মাঝে। বারবার কাকাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করছিলাম কথা বলতে বলতে! কাকাকে আসলে শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম এবং ভয়ও পেতাম!

২০০৭ সালের ১২ মে মধ্যরাতে আমার আব্বা মারা যান। তার আগে পাবনা সদর হাসপাতাল থেকে যখন অসুস্থ আব্বাকে ঢাকায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এম্বুলেন্সে, তখন কাকা আমার হাতে টাকা গুজে দিয়ে বললেন,

এগুলো রাখো। আর বললেন, যখন যেটা লাগে জানিও। আমরা ঢাকায় গেলাম। যে কয়দিন আব্বা হাসপাতালে বেঁচে ছিলেন, কাকা প্রতিদিন সকাল হতে রাত পর্যন্ত আব্বার পাশে বসে থাকতেন। আব্বার হাত ধরে থাকতেন, যেন আব্বা সাহস পান। একদিন তো পুরো রাতই ছিলেন, সেদিন আব্বার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আব্বার মৃত্যুর পর যতবার কাকার সাথে দেখা হয়েছে, কাকা ভালো করে লেখাপড়া করার কথা বলেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

কাকার সাথে শেষ কথা হয় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। যখন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন চলছিল। আমার অফিস ছিল না। কাকা ফোন দিয়ে আমার ও বাড়ির সবার খোঁজ নিলেন। সাবধানে থাকতে বললেন সবাইকে। লকডাউনেও সময় গড়াতে থাকল। একদিন জানতে পারলাম, কাকা করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। চরম উৎকণ্ঠার দিন শুরু হলো। তার পর হুট করে আচমকা সব শেষ হয়ে এলো। বাতি নিভে গেল। যেন এক সাথে লক্ষ-কোটি তীক্ষ্ণ তীর বুকে আঘাত করল আমার। কত কথা না বলা থেকে গেল। কত অভিমান বলা হলো না আমাদের। কত অমীমাংসিত আবেগ উবে গেল হাওয়ায়। বড় একা হয়ে গেলাম।

কাকার শরীরের ঘ্রাণের সাথে আব্বার শরীরের ঘ্রাণের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। কাছে গেলেই এটা আমি অনুভব করতাম। আব্বার মৃত্যুর পর বারবার কাকাকে আব্বা বলে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। কেন পারিনি? জানি না কিছুই। হয়তো প্রকৃতিই চায় না সবকিছুপরিপূর্ণ হোক। কাকাকে যখন সমাহিত করছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমার আব্বাকে ধরে আছি। মনে হলো, আব্বার মৃত্যুর ১৩ বছর পর আবার আব্বাকে ছুঁয়ে আছি। নিয়তির নির্মমতা হয়তো একেই বলে।

গণমানুষের প্রিয় মানুষ, প্রিয় ডাক্তার, মানুষের অন্তরে চিরকাল বেঁচে থাকবেন ভালোবাসায়। ভালোবাসার নীল মণিহার জনতা যে তাঁকেই পরিয়েছেন। আমার কাছে আমার ডাক্তার কাকা শত শত পৃষ্ঠার ইতিহাসের চেয়েও বড় ইতিহাস হয়ে থাকবেন সারাজীবন।

অভিভাবকতুল্য ডাঃ ইউনুস

আব্দুল খালেক

আমি জানি না কী কারণে 'ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মারকগ্রন্থে' আমাকে লেখার দায়িত্ব দিয়ে একটা বিপদে ফেলা হলো! বিপদ বলছি এই অর্থে, ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে নিয়ে কোনো কিছু লেখার জন্য প্রধান যে দুটি যোগ্যতা--রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ব্যক্তিগত সংস্পর্শতা, তাঁর কোনো কিছুই আমার নেই। এমন একজন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, যিনি ছিলেন শাহজাদপুরের বাতিঘর, আইকন, প্রথিতযশা চক্ষু বিশেষজ্ঞ, মানবিক চিকিৎসক, এলাকাবাসীর পারিবারিক বন্ধু, সজ্জন, আদর্শিক রাজনীতিবিদ। এখন তো এধরনের চরিত্র একেবারেই বিরল। নিজের শিকড় থেকে যত দূরে নিয়ে নিজেকে, নিজের অতীতকে গৌরাবান্বিত করার প্রবণতা এই শহুরে জীবনে এখন খুব প্রবল। এগুলো থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলীর এই জীবনবোধ, এই পরিচয়বোধই তাঁকে সবচাইতে বেশি অনন্য করে তোলে। আর অনন্যতা আমরা খুঁজে পাই তাঁর বিগত দিনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। এটা খুব অবলীলায় স্বীকার করছি, ডাঃ মোঃ ইউনুস খানের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহ ছিল, কৌতূহল ছিল। আর তাঁর মূলত দুটো কারণ ছিল তাঁর মানবসেবা, জীবনবোধ এবং সাধারণ জীবনযাপন। মানবসেবা, জীবনবোধ আর সাধারণ জীবনযাপনের এ রকম ভারসাম্যপূর্ণ অনুশীলন প্রচণ্ড মোহ তৈরি করেছিল ডাঃ মোঃ ইউনুস খানের প্রতি। এ রকম সম্ভব হয়েছিল 'আমি কৃষকের পোলা'--তাঁর এই জীবনবোধের কারণেই। গোত্র-ধর্ম, সম্প্রদায়কে পেছনে ঠেলে ফেলার জীবনবোধই তাঁর জীবনের ভিত্তি। সেজন্য তিনি ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন সমষ্টির মাঝে। এই বোধের কারণেই তিনি আগেকার এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তার হয়েও অন্যত্র যাননি।

এমন একজন অভিভাবকের শূন্যতা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের জীবন থেকে আমরা যেন কিছুনিতে পারি, শিখতে পারি। উনি যেন ওপারে ভাল থাকেন এই দোয়া করি।

ডা. মো. ইউনুস আলী খান
একজন মানবিক চিকিৎসকের আলেখ্য

খন্দকার শামছুল হক সজল

২০২০ সালের ২৪ জুন আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। দীর্ঘ প্রায় ২১ দিন ঢাকার ইস্পালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে শাহজাদপুরের সর্বস্তরের মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মূল ধারার মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন সংগঠন শোকবার্তা প্রকাশ করে।

সমগ্র বিশ্বের করোনা দুর্যোগকালে যখন প্রতিদিন শত শত প্রথিতযশা মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করছেন, তখন একজন বিশেষ মানুষের মৃত্যু কেন সবাইকে বিচলিত করে তুলল? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের জীবন ও কর্মের ওপর এবং শাহজাদপুরের মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের গভীরতার দিকটিতে আলোকপাত করতে হবে। আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় এ কাজের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নই। প্রথমত, ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং একজন পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সাথে আমার যোগাযোগও খুব কম হয়েছে। তৃতীয়ত, তাঁর অন্য কোনো ক্ষেত্রের সাথেও আমার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তা হলে আমি কেন তাঁর সম্বন্ধে লিখছি? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর হলো--ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান পেশাগত, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে শাহজাদপুরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলেন। আর এই কারণেই আমি এবং আরও অনেকেই যাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশা করেননি, তাঁদের অস্তিত্বের সাথেও তিনি ওতোপ্রতোভাবে মিশে ছিলেন। এ এমনই এক সত্তা যা কোনোভাবেই আলাদা করা যায় না। তিনি গত শতাব্দীর ৪০-এর দশকে পাবনা সদর উপজেলার চরতারাপুর ইউনিয়নের দুবুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। তার পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এই হলো তাঁর শিক্ষাজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে তিনি শাহজাদপুর থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। এখান থেকেই শুরু হয় শাহজাদপুরের

মানুষের সাথে তাঁর মেলবন্ধন। একটা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল ভগ্নপ্রায়। তাছাড়া ১৯৪৭ এর পর ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যান্য সেক্টরের মতো স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নেও কোনো আগ্রহ দেখায় নাই। ফলে জেলা শহরগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও, শাহজাদপুরের মতো থানা পর্যায়ে এ খাতের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। আমার ছেলেবেলায় দেখেছি, অসুস্থ মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল কয়েকজন এলএমএফ ডাক্তার এবং কিছুচিকিৎসা সহকারী। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জেলা শহর অথবা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হতো। তখনকার যাতায়াত ব্যবস্থায় যা খুব একটা সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। এ রকম একটা বাস্তবতায় স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিটি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবেই ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান এবং শাহজাদপুরের মানুষের একটা মেলবন্ধন ঘটে।

সে সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে, তাঁর আগমন শাহজাদপুরের মানুষের মনে নিঃসন্দেহে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস প্রবাহিত করেছিল। তাঁর নিষ্ঠা, অমায়িক ব্যবহার ও সহজাত সারল্য সাধারণ মানুষের মনে একটা চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে। সাধারণ মানুষ তাঁকে নিজেদের খুব কাছের একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। যার কাছে যেকোনো অসুবিধায় যেকোনো সময় যাওয়া যেতে পারে। এই যে একটা স্বস্তিবোধ এবং আস্থার জায়গা তিনি মানুষের ভিতর তৈরি করতে পেরেছিলেন। যে কারণে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। স্বজন হারানোর বেদনায় শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে।

শাহজাদপুর এবং আশপাশের কয়েক উপজেলার মানুষের কাছে তিনি একজন কিংবদন্তিতুল্য চিকিৎসকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর থেকে চক্ষুরোগের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি প্রচুর মানুষের চোখের চিকিৎসাও করতেন। যখন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সাধারণের নাগালের বাইরে ছিল, তখন তিনি অসংখ্য মানুষকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থায় রোগ নির্ণয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমেই রোগ নির্ণয় করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে শাহজাদপুরের কিছুভাগ্যবান ব্যক্তি বিভিন্ন জেলা সদরে অথবা রাজশাহী গিয়ে রোগ নির্ণয় করে আসত।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান প্রথম মানুষের এই দুর্দশার কথা চিন্তা করে বিপুল অর্থ ব্যয়ে শাহজাদপুরে ডায়াগনস্টিক সেবা চালু করেন। শাহজাদপুরের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি পেশাগত জীবনের উন্নতির পথ ত্যাগ করেন। উচ্চ পদে পদোন্নতি পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি তা গ্রহণ না করে শাহজাদপুরে থেকে যান। স্বাভাবিকভাবেই তিনি হয়তো চিকিৎসা বিভাগের উচ্চ পদে আসীন হয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শাহজাদপুরের মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা

তিনি আমৃত্যু বজায় রেখেছেন। বিনা ফিতে চিকিৎসা প্রদান এমনকি নিজের পয়সায় গরিব রোগীকে ওষুধও কিনে দিতেন।

তাঁর এই মহৎ রূপটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়, যখন কিছুব্যতিক্রম বাদে সমগ্র দেশের চিকিৎসক সমাজ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ঘরে বসে থেকেছেন, তখনও তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের চিকিসাসেবা অব্যাহত রেখেছেন। মৃত্যুর ভয়ে চিকিৎসাপ্রার্থী মানুষের ডাকে সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকেননি। যথারীতি তিনি তাঁর প্রাত্যহিক সেবার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ তাঁকে কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এমনই ছিল তাঁর দায়িত্বশীলতা।

এ রকম একজন চিকিৎসকের আকস্মিক প্রয়াণে শাহজাদপুরের চিকিৎসাসেবার জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা বলাই বাহুল্য। আর সে শূন্যতা সহজে পূরণ হবে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিকপাল মানুষের মতো তিনিও মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসনে আসীন থাকবেন। তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ শাহজাদপুরে অনেকেই আছেন, তাই সেদিকে আমি আর যেতে চাই না। যোগ্যতম ব্যক্তিরাই হয়তো এ গ্রন্থেই সে বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

পরিশেষে শাহজাদপুরের আর সব মানুষের মতোই আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তিনি যেন পরপারে তাঁর এই মানবসেবার স্বীকৃতি পান এবং মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে জান্নাত নসীব করেন।

মা

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

মাগো মা বলে ডাকব কারে চলেগেলে নাফেরারদেশে।
ফেলে গেলে নীরবে মা
মায়ায় গড়া স্বজনেরে।
চিরতরে হারিয়েগেল
মধুর ডাক মা আমার।
রইল না ভবেমোর
মা ডাকবারকেউ আর।
মায়ের মুখভেসে ওঠে
অহরহ মানসপটে।
গর্ভে ধরে আনলে ভবে
স্তন দানে বড় করলে ধীরে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসো মাগো আঁচলের আড়ালেরেখো।
খাইয়ে ঘুমিয়ে দিয়ে
গেছো নিত্য কাজে ফিরে।
মাগো ডাকব কারে
বলো মা, মা বলে।
চির নিদ্রায়গেলে মা চলে
বাবার ডাকে সবফেলে।
সুখে থাকো মা শান্তিতে থাকো বাবার কবর-পাশে কাল কালান্তর। দোয়া করো মা কবরথেকে রেখে যাওয়া স্বজনেরে।
মা তুমি আজ নাই মাঝে
শূন্যতায় অন্তর কাঁদে।
অজান্তে আসে মা জল
দু নয়ন ভরে চিবুকবেয়ে। আরকোনোদিন পারব না মা মা বলে ডাকতেতোমায়। ক্ষণে ক্ষণে মন ডুকরে ওঠে নীরব ক্রন্দন অশ্রুজলে।
বুক ফাটে মাতোমায়ভেবে ভাবি নাই যাবেছেড়ে।
নাম ধরে ডাক শুনব না আর মায়ের মতো মধুর করে।
তোমার ডাক কানে মা বাজে মন বলে আছো মাঝে।

শীতে গরমেরেখেছ আগলে বুকে জড়িয়ে পাখা চালিয়ে।

লণ্ঠন হাতে গভীর রাতে
নিয়েছ মা অরণ্য-পাশে প্রকৃতির ডাকে। বিরক্তি তোমায় করে নাই স্পর্শ শৈশবের শত ঝামেলাতে।
মনে পড়ে না রাগ মুখ তোমার
করেছ কভুমোদের তরে।
আদরভরা নাম ধরে ডাক
দেবে কে মা তুমি ছাড়া?
আর কোনোদিন শুনব না মা
প্রাণ ভরা সে মিষ্টি ডাক।
ছেড়ে গেলে রেখে গেলে
অমর স্মৃতি আমরণ।
মা মোদের ছেড়ে গেল পরপারে এতিম মোরা এ ভবে চির তরে। শূন্য হলো মায়ের ছায়া
হারিয়ে গেল নীরব দোয়া।
রোগ শিয়রে বসে মা কত
দিয়েছ ললাটে হাত বুলিয়ে।
পুড়ে গেল কপাল চির তরে
দু হাজার পনেরোর বারই সেপ্টেম্বরে।
মা চলে গেল ধরণী ছেড়ে
ধরিত্রী কোলে চির নিদ্রায়।
রোগ-যন্ত্রণায় অবুঝ মনে
ডাকছি মাকে মা মা বলে।
মায়ের সাড়া আসবে না জেনেও মা ডাকেই শান্তি মেলে।
মা মাগো মা পাব না মা
তোমার আদর আর কোনো কালে। দৃশ্যে ভাসে তোমার ছবি
ডাকে যেন আড়াল থেকে।
অজান্তে আসে মনে বিদেশে যাবার আগে যাব মাকে দেখতে গাঁয়ে।
গত বারে মাকে বলে
বিদায় দিল মা হাসি মুখে।
পান খাওয়া লাল ঠোঁট আজও
চোখে ভাসে জ্যান্ত রূপে।
হাসি মুখে বিদায় দিল
দিল খোলা আশিস মায়ের।

অপরূপ মার হাসিখানি
চোখে ভাসে আজও অন্তর কাঁদে। আসবে না মা আর কোনোদিন

সুখে দুখেমোদের মাঝে।
মা ডাকটা মুখথেকে মা
চলেগেল চির তরে।
দোয়া করি মগ্ন মনে
সুখে থাকো মা পরপারে।
তোমার মুখ ভাসলে মনে
অঝোরে জল আসে দু নয়নে। মা মাগো মা, ডাকব কারে
ছেড়ে গেলে ফেলে রেখে চিরতরে। ডাকবে না মা আরকোনোদিন নাম ধরে বা বাজান বলে।
কোন অভিমানে রেখে গেলে মা তোমার মায়া ভরা গড়া সংসার?

অনাগত বিহঙ্গ

মো. শাহ আলম

কত দিন সখা পাই নাতোদেখা আছকোন অচিনপুর
কোন বিজনে রয়ে যাও তুমি শুনি না কূজন সুর।
চরম গ্রীষ্মে শরণকোথায়?
হাহাকার চারিধার
প্রশান্তির নববার্তা এনে
জুড়াও প্রাণ সবার।
শীতের প্রকোপে গাছ কুপোকাত জীবজন্তু নির্জীব
জীর্ণ পত্রপল্লব ঝরায়ে
করো সব সজীব।
সুরেতোমার বাড়ে লতাপাতা ফুল ভরেফেলে ডাল
তুমি না আসলে আসবে না কিন্তু ঋতুরাজ বসন্তকাল!
প্রাণীদের সাথি, পাখিদের জ্ঞাতি কুহু রবে দাও ভরে
তুমি না আসলে আশার মুকুল অকালেই যাবে ঝরে।
অলিরা আসে, কলিরা হাসে চরাচর হয় মুখর
তোমার আসার আশায় বসে আছে সব সহচর।
২৩
সকলের নীড়ে শান্তি আনতে
গড়ো না নিজের নীড়
আসলে তুমি দুঃখের দেশে
সুখ এসে করে ভিড়।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক (নোট : এটা দিয়ে কিছু বোঝা যায় না।)

একজন বাতিঘর এবং বেঁচে থাকার মানে

সেজান মাহমুদ

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আমেরিকার ওকালা শহরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা চিকিৎসক ইসমাত আরা পারভীনের বাসায়। নেমন্তন্নের সময়েই বলেছেন, আপনার সঙ্গে আমার বাবার পরিচয় করিয়ে দেব। আমরাও কিন্তু সিরাজগঞ্জের মানুষ। আপনার সঙ্গে অনেক মিলবে আমার বাবার। তিনিও রাজনীতি পছন্দ করেন, সাহিত্য-সংগীতের প্রতি অনুরাগী।

আমি যখন তাঁর সামনে গেলাম তখন সব কিছুছাপিয়ে আমার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গেল। আমিও সিরাজগঞ্জের মানুষ, আর আমার বাবাকে হারিয়েছি ৩১ বছর আগে। আমি তখন মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এখন পিতৃতুল্য কাউকে দেখলেই কি বাবার কথা মনে পড়ে? না, তা কিন্তু না। কারও কারও আদল, কথার ভঙ্গি, স্নেহ বা বাৎসল্যের ধরণ দেখে এই মনেপড়াটা বেশি হয়।

যাঁর কথা বলছি তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা বঙ্গবন্ধুপরিষদের সভাপতি, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ জমতে একটুও সময় নিল না। রাজনীতি থেকে শুরু করে, সামাজিক সংকট, দেশের শহর আর গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ফাঁরাক, এমনকি আমার গানের প্রসঙ্গও এলো। কিন্তু আমি পেশায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করি শুনে এই প্রথম কোনো প্র্যাক্টিসিং ডাক্তার এমন অকৃত্রিম প্রশংসা করলেন। বেশির ভাগ মানুষকে দেখি গৎবাঁধা কিছুর বাইরে নেয়ার বা বোঝার ক্ষমতাই রাখেন না। ধীরে ধীরে কথার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি তাঁর দূরদৃষ্টি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি অসম্ভব সৎ, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী একজন চিকিৎসক। পরে আরও জানলাম, তিনি দরিদ্রদের বিনা পয়সায় চিকিৎসাসেবা দিতেন। শাহজাদপুরে আমার মেজভাবির বাড়ি। মজার ব্যাপার হলো সেই ভাবিকে মেজভাইয়ের জন্যে নির্বাচন করতে আমার বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন; অথচ আমি বাড়ির ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আমার বাবা ও মায়ের এ রকম আস্থা ছিল আমার প্রতি। সেই গল্প শুনে তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, বয়স দিয়ে তো আর জীবনবোধ তৈরি হয় না, তাঁর সঙ্গে প্রজ্ঞাও থাকতে হয়। আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম। জীবনবোধ, প্রজ্ঞা নিয়ে তো আজকাল মানুষের সঙ্গে কথা বলাই দুষ্কর। ধীরে ধীরে আরও জানতে পারি, তাঁর সেই প্রজ্ঞা আর জীবনবোধ কতেটা গভীরে প্রোথিত ছিল। সেজন্যই সেই শাহজাদপুরে রবীন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারেন। সিরাজগঞ্জ তথা শাহজাদপুরের মানুষের আজীবন সেবায় নিবেদিত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী এই মানুষটি কোভিডের বিশ্বমহামারির সময়েও মানুষের সেবা দিয়ে গেছেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এভাবেই তিনি একজন একক মানুষ থেকে হয়ে উঠেছিলেন বহু মানুষের নির্ভরতা, আশ্রয়, যেন একজন যথার্থ 'বাতিঘর'।

আমি আমার জীবনে চলার পথে অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। সবার তো বড় কোনো প্রভাব থাকে না বা সবাই তা রাখতে পারেনও না। কিন্তু মাত্র কয়েকবার দেখা হওয়া এবং গল্প করার মধ্য দিয়ে তিনি এক অনিবার্য প্রভাব গেলেন আমার জীবনে। তা শুধু নিজের বাবাকে মনে করিয়ে দেওয়া নয়। এখন মানুষ হিসেবে যা এই সময়ে সবচেয়ে দুর্লভ তা হলো চিন্তা-চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং মানবতাবাদী মন ও মননের অধিকারী হওয়া। সেই মননের অভিঘাতে আমার স্মৃতিতে তিনি রেখে গেলেন এক অবিনশ্বর স্বাক্ষর, যা আমাকে অনুপ্রেরণা দেবে জীবনের কঠিনতম দিনগুলোতে। তিনি সত্যিকার অর্থেই এক 'বাতিঘর', যিনি আলোকিত করেন চারপাশের মানুষের জীবন। আমার জীবনে এই মহার্ঘ্য সান্নিধ্য ও স্নেহপ্রাপ্তিই আমার বেঁচে থাকার অন্য এক মানে।

২ সেপ্টেম্বর ২০২০

(সেজান মাহমুদ: বাঙলা ভাষার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক। সহকারী ডিন ও প্রফেসর অব মেডিসিন, ইউসিএফ কলেজ অব মেডিসিন, অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা, ইউএসএ।)

কাকার কাছে ভাতিজির চিঠি

ডলি (নোট : পুরো নাম থাকা উচিত)

কাকা আমাদের বাবার থেকেও বেশি ছিলেন। তাঁর অবদান লিখে শেষ করা যাবে না। সারাজীবন কাকা শুধু আমাদের দিয়েই গেছেন, বিনিময়ে আমরা তাঁকে কিছুই দিতে পারিনি। এমনকি শেষ বিদায়ে চোখের দেখা এবং একমুঠো মাটিও না। এটা মনের মধ্যে সব সময় কষ্ট দেয়। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই কষ্ট থাকবেই। মানুষ মরণশীল--এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ হোক কাল হোক সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। কিন্তু কাকা যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তাঁর হাসিমাখা মুখখানা আমরা আর কোনোদিনও দেখতে পাব না। সবাইকে কাঁদিয়ে কাকা না ফেরার দেশে চলে গেছেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেস্ত নসিব করুক এই কামনা করি।

ডা. ইউনুস : দায়িত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ

ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান

রাজনৈতিক সামাজিক ও চিকিৎসা অঙ্গনে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের অবদান কমবেশি সবাই জানেন। তাঁর সম্পর্কে লেখার ভাষা আমার নেই। তবুও লেখার চেষ্টা করছি। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের নামটাই আপাময় জনগনের কাছে একটা রোগের মহাওষুধ। কতটুকুআস্থা অর্জন করলে মানুষের মনে এভাবে স্থান পাওয়া যায়! মানুষ হিসেবে আমার কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন অতি মানব। তিনি কাউকে নাম ধরে ডাকলে মনে হতো মায়াভরা এক দরদি ডাকছে।

সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তারই মেজো ভাবির বোনকে। দুজনই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তাঁর মেজো ভাই ডাঃ মোঃ সেকেন্দার আলী খানের স্বপ্ন ছিল তাঁকে (ইউনুস আলী খান) বিদেশে পাঠিয়ে বড় ডাক্তার বানানো। তাঁদের পিতা হারুণ-অর রশিদ ধনাঢ্য হওয়া সত্ত্বেও ভালো রেজাল্ট করা ইউনুস আলী খানকে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তার ব্যবসায় সহায়তা করতে বলেন। তখনই বাধ সাধেন তাঁর এই মেজ ভাই ডাঃ সেকেন্দার আলী খান এবং তিনি ইউনুস খানের লেখাপড়া দায়িত্ব নেন। টাটিপাড়ার পৈতৃক ভিটা ছেড়ে দুবলিয়া বাজারে পাড়াবাড়ি ধরে কপর্দকহীন হয়ে চলে আসেন। দুবলিয়া বাজারেই তাঁর চেম্বার ভাইয়ের ব্যয় বহন করতে গিয়ে অনুভব করেন তাঁর সন্তানসন্ততি বেশি হয়ে গেছে। পরে যদি অনটনে পড়েন এবং তখন যদি ভাইটির বিদেশে পড়ানোর সাধ্য না থাকে, এই ভেবে তখনই ৫ বিঘা জমি লিখে দেন। তিনি ছিলেন জনদরদি একরোখা চিকিৎসক। তাঁর ন্যায়নীতি ও সেবায় কর্তব্যনিষ্ঠায় মানুষ খুবই মুগ্ধ ছিল। ওই ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যানের অত্যাচার এবং দুর্বলদের সম্পত্তি দখলের মতো নীতিহীনতায় মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। নিজেরাই সব খরচ বহন করে ইউনিয়নের মানুষ ডাঃ সেকেন্দার আলী খানকে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। চেয়াম্যানের দায়িত্ব নিয়ে ভুক্তভোগীদের বেদখল হওয়া সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে থাকেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে আগের চেয়ারম্যান ভাড়া করা সন্ত্রাসী দিয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

এই সময় ইউনুস খান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পড়াশোনার ব্যয়ের অনিশ্চতয়তা মাথার উপরে থাকলেও, ভাইয়ের দেওয়া ওই ৫ বিঘা জমিতে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ভাইয়ের শ্যালিকাকে বিয়ে করে অভাব উৎরে পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং ১৯৬৯ সালে এমবিবিএস পাশ করেন। উপযুক্ত সময়ে ভাইয়ের ছেলেদের নামে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেন। সেই

বছরই তাঁর ঘরে আসে প্রথম সন্তান। ইন্টার্নশিপ শেষ করে সরকারি চাকরিতে যোগদান না করে নিজ জেলা পাবনা সদরে বাসা ভাড়া করে প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করেন। মাথার ওপর সদ্য প্রয়াত বড় ভাইয়ের ৬ সন্তান ও নিজের পরিবারের দায়িত্ব।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পাকসেনাদের হামলা থেকে পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে তাঁদের নিয়ে অনেক পথ ঘুরে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। আড়ালে থেকে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা ও চিকিৎসা দিয়ে যান। বড় ভাইদের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনিও ছিলেন আওয়ামী লীগের সমর্থক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঠিক করেন পাবনার চেম্বারে বসবেন না। বিশাল পরিবারের চিন্তা মাথায় রেখে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরি নেন। মেডিকেল অফিসার হিসেবে পোতাজিয়া থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগ দেন। গোটা পরিবার নিয়ে সরকারি কোয়াটারে ওঠেন। নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের সেবা দিতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বন্ধুবৎসল বড় ডাক্তারের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। পায়ে চালিত সাইকেল নিয়ে হাসি মুখে দূর-দূরান্তে ছুটে যেতেন রোগীর চিকিৎসার জন্য। রোদ-বৃষ্টি, ঝড় মাথায় নিয়ে অনেকবার দুর্ঘটনা ও দুর্যোগের মধ্যে পড়েছেন। রোগীরা যা দিতেন, তা না দেখেই হাসি মুখে পকেটে ভরে নিতেন। এমনও দেখা গেছে কেউ দুই টাকাও দিয়েছে। বলতেন, টাকা নয় এটা রোগীদের দোয়া। তাঁর উদারতার অনেক উদাহরণ আমরা জেনেছি। এর মাঝে চাকরিতে প্রমোশন পেয়ে শাহজাদপুরের রোগীদের কথা চিন্তা করে, বিশাল পরিবারের চাপ থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র যোগদান করেননি। এর মধ্যে গোল্ড মেডেলিস্ট চক্ষু চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ এম এ মতিনের অনুরোধে সিরাজগঞ্জের বিএনএসবি আই হসপিটালের ডেপুটেশনে দায়িত্ব নিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া যান। প্রশিক্ষণ শেষে বিএনএসবি হাসপাতাল ও শাহজাদপুরের চেম্বার সমান তালে সময় দেন। তখন তাঁর চলার বাহন মটর সাইকেল।

একদিন সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে প্রায় অন্ধ এক বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে দেখে, টর্চের আলোয় তাঁর চোখ দেখেন। তারপর নিজের মোটর সাইকেলে বৃদ্ধ রোগীকে চড়িয়ে বিএনএসবিতে নিয়ে যান এবং অপারেশন করে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। বৃদ্ধটি ছিল এক ভিক্ষুক। এমন একজন সেবক সত্যিই বিরল নয় কি? একদিন সিরাজগঞ্জ থেকে শাহজাদপুর চেম্বারে আসার পথে কম বয়সী সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই দুর্ঘটনার পড়েন। সাইকেল চালক পালিয়ে যায়। একটা বাসের ড্রাইভার হেড লাইটের আলোর রাস্তার পাশে মোটর সাইকেল দেখে বাস থামান এবং দেখেন ডাক্তার সাহেবের মোটর সাইকেল পড়ে আছে। তাঁকে খুঁজে পান রাস্তার পাশে ডোবার মধ্যে। মাথার রক্তক্ষরণ দেখে গামছা পেচিয়ে শাহজাদপুরে নিয়ে যান। একটু সুস্থ হয়ে ওই অবস্থায় রোগীর সেবা দেওয়া শুরু করেন।

বেশি লেখাপড়া না করে পল্লি চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রাম্য ডাক্তার হন তাঁর ইমিডিয়েট ছোট ভাই হাসান খান। মেজো ভাইয়ের মতো চেয়ারম্যান হওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁর সামনে কেউ অন্যায় করে পার পায় না। তাই তাঁকেও সন্ত্রাসীরা

গুলি করে হত্যা করে। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী আবারও দায়িত্ব কাঁধে নেন ছোট ভাইয়ের পরিবারের। এই ভাইয়ের একমাত্র নাবালক ছেলেকে কাছে নিয়ে আসেন। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়াকালীন ছেলেটিও হয় প্রতিবাদী। শান্ত প্রকৃতির মানুষ ডাঃ মোঃ ইউনুস খান ছেলের স্বভাব বুঝতে পেরে, আবারও কোনো অঘটন যাতে না ঘটে সেটা ভেবে অনেক ব্যয় করে উচ্চশিক্ষার জন্য রাশিয়া পাঠিয়ে দেন। মেজো ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করতে অপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। একজন স্নাতক, দুইজন স্নাতকোত্তর ও তিনজন উচ্চ মাধ্যমিকেই ইতি টানে। একদম ছোট ভাইকে কাছে এনে পড়াশোনার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন, বাড়ি চলে যায় এবং মেয়েও ট্রেনিং নিয়ে পল্লি চিকিৎসক হয়। এই ছোট ভাই তাঁর মেয়েকে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ানোর আবদার নিয়ে এলে সেই দায়িত্বও কাঁধে নেন। তিন বছর বিশাল খরচ চালানোর পর জানতে পাবেন, তার সব টাকা জলে গেছে। কারণ, মেয়েটি ৩ বছরে প্রথম বর্ষের গন্ডি পার হতে পারেনি। সেটা গোপন করে তৃতীয় বর্ষে পড়ে বলে আবারও টাকা চাইতে এলে তিনি খুব কষ্ট পান।

এদিকে মেজো ভাইয়ের লিখে দেওয়া সেই ৫ বিঘা জমির ওপর নজর পড়ে তাঁর কাছে থেকে ডিগ্রি পাশ করা ৫ম ভাইয়ের উদারতা, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্বশীলতা অবতার যিনি তিনি উচিৎ মনে করায় মেজ ভাইয়ের কথা বললেই সব সময় বলতেন মেজ ভাইয়ের মতো কর্তব্য পরায়ন ও বড় মনের মানুষ হয় না " (নোট : এসব কথা কি থাকা উচিত?) কত বড় মন থাকলে বিশালত্ব ঢেকে রেখে অন্যকে বড় করে তুলে ধরতে পারে। তাই মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটির পাপ ভুল বিচার না করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করো। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবাইকে এই দুঃখ সইবার শক্তি দাও এবং মনকে প্রশান্ত করো।

(লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর; (নোট : কীসের ডাইরেক্টর?) ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের মেজো ভাই ডাঃ সেকেন্দার আলী খানের জামাতা)

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মরণে সেকেন্দার ক্লিনিক (নোট : শিরোনামটা বুঝলাম না)

মো. আবু সাঈদ সরকার

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একজন আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষের সেবায় জীবনের বেশি সময় ব্যয় করেছেন। তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কাজ করে গেছেন। চিকিৎসার টাকা না থাকলে ভিজিট না নিয়ে ফ্রি রোগী দেখেছেন এবং নিজের ফার্মেসি থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ পর্যন্ত দিতেন। রোগীর সংখ্যা বেশি হলে, তিনি বিরক্তবোধ করতেন না। প্রত্যেক রোগীকে কাছে বসিয়ে সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে চিকিৎসাপত্র দিতেন। চিকিৎসায় তার অনুভূতপূর্ব সাফল্য রয়েছে। আমার পরিবারের চিকিৎসা তাঁকে দিয়ে করিয়েছি। তাঁকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর মতো ডাক্তার বিরল। একজন রোগীর জন্য

কোন চিকিৎসা বা ওষুধ প্রয়োজন সেটি সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত থাকতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁর কাছে ছাত্ররা এলে, তাদের বসতে দিয়ে হাসিমুখে উপদেশ দিতেন। ছাত্রদের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে বলতেন।

তিনি আত্মত্যাগী ছিলেন। মোট কথা একজন ভালো মানুষের সমস্ত গুণাবলি তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর আচরণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যেত। তাঁর মৃত্যুর শোকাহত পরিবারকে আল্লাহ যেন শোক সইবার ক্ষমতা দেন। পরিশেষে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি, আল্লাহ যেন তাকে বেহেশত নসীর করেন। আমিন।

(লেখক : সাবেক ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শাহজাদপুর শাখা, সিরাজগঞ্জ।)

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

আলহাজ্ব মো. ইউসুস আলী ও আলহাজ্ব মো. রাকিবুল হাসান (আধু)

(লেখক কী দুজন?)

ডাক্তার হিসেবে ইউনুস খান ছিলেন শাহজাদপুর উপজেলার সবার অতি পরিচিতি। আমিও ডাকে ডাক্তার হিসেবে ১৯৮০ সালে প্রথম বছরের মতো সাক্ষাৎ। আমার বাবার চিকিৎসার জন্য আমি এলাকায় কোনো ডাক্তার পাইনি এবং কোনো এমবিবিএস ডাক্তার পল্লি এলাকায় তখন আসেনি। আমি ওনাকে আমার বাবার কথা বলার সাথে সাথেই বহু কষ্ট করে আমার সাথে চর বেলতৈল গ্রামে চলে আসেন। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অনেক উদার ও জনদরদি ছিলেন। সেই থেকেই আমি ডাক্তার হিসেবে ওনাকেই চিনি এবং আমার সব ধরনের অসুখের জন্য ওনার কাছে যেতাম। আমার জানামতে, তিনি কোনোদিন কোনো রোগীর প্রতি রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। ডাক্তার হিসেবে তিনি ছিলেন সবার চোখের মণি। আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা করি। তিনি যেন ওনাকে বেহেস্ত নসিব করেন। পরিশেষে তাঁর পরমাত্মার মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

(লেখক : চর বেলতৈল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। লেখক : পরিচয় পূর্ণাঙ্গ করতে হবে।

আমি ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সাহেবকে যেভাবে দেখেছি

মো. আব্দুর রহিম

শাহজাদপুরে চিকিৎসক হিসেবে বলতে গেলে তখনকার সময়ে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সাহেবকে দেখা যেত। আমার চিকিৎসা ব্যবসায় আসার আগে তাঁকে দিয়েই পরিবার এবং প্রতিবেশীদের বেশির ভাগ রোগী দেখতাম। তখন থেকে আমাকে ভালোভাবে চিনতেন। সব সময় চেম্বারে রোগীর ভিড় লেগে থাকত। বিরতিহীনভাগে তিনি রোগী দেখেই চলতেন। কোনো প্রকার বিরক্তি নেই। সারাদিন রোগী দেখে রাত ৯টা ১০টা, ১২টায় এলাকায় দূর-দূরান্তে মোটর সাইকেলে করে যেতে দেখা গেছে। যে মটর সাইকেল তাঁর ভাতিজা হেলালকে চালাতে দেখা যেত।

১৯৮১-৮২ সালে আমি থেকে চিকিৎসা পেশায় আসি। কোনো সমস্যা হলে তাঁর কাছে যেতাম পরামর্শ নিতে। তিনি কোনো রকম বিরক্ত না হয়েই সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিতেন, তাতে আমার রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা হতো। তখনকার সময় ২০ টাকা নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতেন। আবার অনেকে ১০ টাকা মুড়িয়ে হাতে দিলে তিনি না দেখেই পকেটে রাখতেন। শাহজাদপুরে তখন কোনো এক্স-রে মেশিন ছিল না। তিনিই প্রথম মুজিব ভবনে এক্স-রে মেশিন স্থাপন করলেন। পাবনা, সিরাজগঞ্জের পরেই শাহজাদপুর।

পরীক্ষার জন্য রোগীদের কাছ থেকে কম খরচ নিতেন। প্লাস্টারের ফি ৭০ টাকার মধ্যে সহযোগীকে ২০ টাকা দিয়ে দিতেন। এমনও দেখা গেছে, টাকা ছাড়াই রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর চেম্বারের সম বয়সী নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপ করতেন। আমি চেম্বারে উঁকি দিলে ওনার নজরে পড়লে, সিরিয়াল ম্যানকে ইশারা দিতেন আমি যেন ভেতরে আসি। কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। বেশ কয়েক মাস আগে থেকে তাঁর সাথে দেখা নেই। শুনতে পেলাম, উনি গুরুতর অসুস্থ। ওনার জন্য দোয়া করতে বলছেন স্বজনরা। শেষ মুহূর্তে তাঁর ভাতিঝি জামাই ডাঃ খালেকুজ্জামান সাহেবের মোবাইল থেকে মৃত্যুর খবর শুনতে পেলাম। এত কাছের মানুষ ডাক্তার সাহেব, করোনার জন্য অথচ তাঁর মুখখানা দেখতে না পেয়ে আমি মর্মাহত।

(লেখক : পল্লি চিকিৎসক, শেফালী ড্রাগ হাউজের মালিক)

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

সেলিম আহম্মেদ

পাবনার সুজানগরের ১৯৪৪ সালের ৩০ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে তিনি বিএসসি পাশের পর ভর্তি হন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে। ১৯৮০ সালে সিঙ্গাপুর থেকে চক্ষুচিকিৎসায় উচ্চতর শিক্ষা নেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়েছেন। তিনি ১৯৭২ সালে শাহজাদপুরে পোতাজিয়া সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। তার পর থেকেই তিনি শাহজাদপুরে মানুষের মনে জায়গা করে নেন। করোনা মহামারিতে তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় লেখার নিজেকে নিয়োজিত রেখে করোনায় আক্রান্ত হন। গত ২৪ জুন ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শাহজাদপুরের 'গরিবের ডাক্তার' নামে পরিচিত ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান।

তুমি আছো আমার অনুপ্রেরণায়-
কেড়ে নিলো তোমায় করোনায়,
পরপারে থেকো ভালো
এটাই আল্লার কাছে প্রার্থনা।

আমার ডাক্তারি পেশার হাতেখড়ি হয় তাঁর হাত ধরেই। তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক ও আমার পথপ্রদর্শক। আসলে তাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে শেষ হওয়ার নয়। তিনি শাহজাদপুরে চিকিৎসাসেবার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে, রয়ে যাবেন শাহজাদপুরবাসীর হৃদয়ে।

(লেখক : মণিরামপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।)

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

ডাঃ আব্দুল মান্নান

৮০-এর দশকে, শাহজাদপুরে চিকিৎসাসেবায় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান জনপ্রিয় ও আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একটি দুর্ঘটনার মধ্যে আমার সাথে পরিচয়। আমি ও বাদল ডাক্তার বাদলের চেম্বারের বসে আছি। সংবাদ পেলাম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। আমরা দুইজন ছুটে গেলাম। ডাঃ আবু সাঈদ সাহেবের চেম্বারে। সেখানে গিয়ে দেখি, ঘটনা সত্য। ডাঃ আবু সাঈদ সাহেব চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। আমি ও বাদল ওখানে সহযোগিতা করলাম। বাম চোখের পাশে একটুকেটে গেছে। ডাক্তার সাহেব নিজের হাতে দুইটি সেলাই করলেন। এটিএস ইনজেকশন দেওয়া হলো। আবু ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান তখন পোতাজিয়া হাসপাতালে বাসায় থাকেন। আমি ও বাদল তাঁকে সাথে নিয়ে পোতাজিয়া বাসায় ছিলাম। তালগাছি থেকে রোগী দেখে মোটর সাইকেলে শাহজাদপুরে ফিরিয়ে দিলেন। তালগাছির একটু দক্ষিণে ইটভাটার কাছে শ্রীখোলার সাথে মটর সাইকেলের দুর্ঘটনা হয়। ওখান থেকে আহত হয় পোতাজিয়া হাসপাতালে চাকরি খুঁজতে শাহজাদপুরের মণিরামপুরে মাহী মেডিকেলে চেম্বারে নিলেন। সেখান থেকে জয়যাত্রা সকাল হতে রাত ৮টা পর্যন্ত অবিরাম রোগী দেখছেন। এরই ফাঁকে আমরা বিরক্ত করতাম। জটিল ও কঠিন রোগী গেলে দৌড়ে ছুটে যেতাম, আমাদেরকে সুন্দর পরামর্শ দিতেন। এই সময় শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগ রাজনীতির খুব দুঃসময়। দলীয় নেতা-কর্মীদের সাহস ও উৎসাহ দিতেন। বাসায় গেলে শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আশীর্বাদ হিসেবে তিনি এসেছিলেন। সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে এই সময় তিল তিল করে জিরায়ে রেখে ছিলেন। জীবন সায়াহ্নেও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করে গেছেন। দক্ষতার সঙ্গে যেমন রোগীর সেবা করতেন, তেমনি সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য কাজ করতেন। তাঁর চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর কর্মকাণ্ড আমাদের জীবনের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

(লেখক : মণিরামপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। নোট : অস্পষ্ট

আমার দেখা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

মো. গোলাম মোস্তাফা

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ১৯৭২ সালে পোতাজিয়া হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদানের পর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন তিনি আমার বন্ধুআব্দুল মগিসের ফার্মেসি 'সাথী মেডিকেল'-এ বসতেন। বর্তমানে যেটা 'আজিজ ম্যানসন' হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান শাহজাদপুর আসায় শাহজাদপুরের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা ক্ষেত্রে আশার আলো দেখতে পায়। একজন ইয়াং এনার্জেটিক এবং ডিভোটেড চিকিৎসক হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা এলাকায় তাঁর চিকিৎসার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শাহজাদপুর এবং আশপাশের উপজেলার জনসাধারণ অব্যাহতি পায় পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা ও আর্থিক ক্ষতি হতে। স্বল্প খরচে জনসাধারণ পেতে থাকে চিকিৎসাসেবা। সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের চেম্বার, যা 'খান সাহেবের চেম্বার' বলেই সর্বাধিক পরিচিতি ছিল। এক বিশ্বাসের নাম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রতিদিন বিকেল অথবা সন্ধ্যার পর তাঁর চেম্বারে যেতাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বসতে বলতেন। এই ধারা চলতে থাকে তাঁর প্রয়াণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। আপ্যায়নে তার জুড়ি মেলা ভার। তাঁর চিকিৎসাদানের ফাঁকে ফাঁকে আমরা যাঁরা থাকতাম, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতেন। বেশির ভাগ সময়েই তিনি কথা বলতেন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা এবং মানুষের নৈতিক বিষয় নিয়ে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। ভালোবাসতেন দেশকে, দেশের মানুষকে। গরিব ও সাধারণ মানুষকে মাগনা (বিনা পয়সায়) চিকিৎসা দিতেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, ওষুধ ও পথ্য নিজের খরচে সরবরাহ করতেন। আশ্রয় দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের।

ডাঃ খান ছিলেন আমার বড় ভাই, আমার চিকিৎসক, আমার গার্জিয়ান, আমার ভরসা এবং আমার আশ্রয়স্থল। অসুখে-বিসুখে, বিপদে-আপদে তাঁকে স্মরণ করতাম। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ আমার কাছে ছিল অমিয় বাণীর মতো। তাঁর প্রয়াণে আমি আমি মর্মাহত হত-বিহ্বল হয়ে পড়ি। অসুস্থ হওয়ার দুই দিন আগে সেলফোনে তাঁর সাথে আমার কথা হয়। তিনি আমার শরীরের খোঁজ-খবর নেন এবং বলেন, Open Heart Surgery-র পর সাবধানে থাকতে হয়। আপনি সাবধানে থাকবেন

এবং তিনি এ-ও বলেন, দেশের যে অবস্থা কখন যে কার কী হয়, সেটা তো আর বলা যায় না। দোয়া করবেন। আমিও তাঁর কাছে দোয়া চাই। এটাই আমাদের শেষ কথোপকথন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।

(লেখক : প্রাক্তন ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শাহজাদপুর শাখা, সিরাজগঞ্জ।)

গরিবের ডাক্তার ইউনুস আলী খান

আলহাজ্ব মো. জিয়াউল হাসান

চিকিৎসক বা ডাক্তার হলেন এক ধরনের মহৎ স্বাস্থ্যসেবা প্রদায়ক, যাঁদের পেশা (অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা বা ডাক্তারি) হলো শারীরিক বা মানসিক রোগ, আঘাত বা চিকারের নিরীক্ষণ, নির্ণয়সহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের চিকিৎসাসেবা ও নিরাময়ের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখা বা পুনর্বহাল করা। যাপিত জীবনের এটা একটা মহতি পেশা যা একজন চিকিৎসকের জন্য জনপ্রিয়তা ও মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে ভালোবাসার শিরোমণি হয়ে প্রবেশ করার সহজতম মাধ্যম। একজন চিকিৎসক বা ডাক্তারের স্বার্থকতা হলো তাঁর জনপ্রিয়তা ও সাধারণ আমজনতার অন্তরের গহীন দ্বিধাহীনভাবে প্রবেশ করা।

অসুখ-বিসুখ সবাইকে নিরূপায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বাঁচার তাগিতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত হয়ে শরণাপন্ন বা দ্বারস্ত হতে হয় একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসা নিয়ে কমবেশি অভিযোগ বা অনুযোগ বা গ্রাত্র দাহের কারণ সবার মাঝেই কমবেশি বিদ্যমান। রোগ ভেদে চিকিৎসক বদলের মতো এই মানবিক পেশাজীবীদের নিয়ে রোগীদেরও অম্লরিক্ত কিংবা অস্বস্তির নানান অভিজ্ঞতাও তৈরি হয়। আবার এমন কোনো কোনো চিকিৎসক রয়েছেন, যাঁদের নিয়ে নানা রকম শ্রদ্ধা দীপ্তময় উজ্জ্বলীয়মান প্রশংসার ফুল ফোটে মানুষের অন্তরে অন্তরে। যাঁদের স্বনামধন্য নাম মনে বা মুখে এলেই এক চিলতে মুখের মুচকি হাসিতে গর্বের সাথে বুক ভরে যায়। ঠিক তেমনিই একজন কর্তব্যপরায়ণ, বিনয়ী মিষ্টভাষী, হাস্যোজ্জ্বল, সদালাপী, সজ্জন, ধার্মিক, মানবিক গুণে গুণান্বিত, আম জনতা ও গরিবের বন্ধুখ্যাত সদ্য প্রয়াত চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। প্রথম সাক্ষাৎ এবং তাঁর মিষ্টি কথায় একজন রোগী ওষুধ-পথ্য ছাড়াই অর্ধেক সুস্থ হয়ে যেতেন। একজন চিকিৎসকের জন্য এটা যে কত বিরাট একটা অবদান, তা সদ্য প্রয়াত চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান মহোদয়ের কাছে অন্য চিকিৎসকদের জন্য শিক্ষণীয়।

আমাদের শুধু শাহজাদপুরবাসীদেরই নয়, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার উল্লাপাড়া তাড়াশ, চৌহালি, কাজীপুর, বেড়া, কাশিনাথপুর, ফরিদপুর, সুজানগরসহ দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছোট-বড় আবাল-বৃদ্ধ ও বনিতদের চোখের মণি হয়ে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সকলের আশা ও ভরসার চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন এই মহৎ মানুষ ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। আমরা দেখেছি ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান মহাদয়কে ডাক্তারি ফি ছাড়াই বিনামূল্যে এলাকার ও আশপাশের গরিব ও

অসহায়দের চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে। এমনকি বিনা মূল্যে ওষুধও প্রদান করতে। আর এমনি করেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবার বন্ধুপ্রতিম অভিভাবক। শুধুযে তাই নয়, বরং জাতির বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় কখনও তাঁর কলমের শাণিত বা মুদ্রিত অক্ষরে, আবার কখনও ছোট পর্দায় ভেসে উঠেছিলেন তিনি সহজাত ভঙ্গিমায় সবার মাঝে প্রাণ চঞ্চলতা নিয়ে। এ যেন কবির ভাষায় বলতে হয়, একই অঙ্গে তোমার কত রূপ...।

কত সহজ করে কঠিন রোগের পথ্য বাতলে দিতেন তিনি। তাঁরই নির্দেশনা বা অভিভাবকত্বে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলাম আমরা এলাকাবাসী। একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের অনুকরণীয় ও ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একজন সুচিকিৎসকের যে গুণাবলি থাকা দরকার ধৈর্য, আন্তরিকতা, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা, ভদ্রতা, নম্রতা ও ত্যাগ--সবই ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্যারকে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা দান করেছিলেন। একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে তিনি নিজস্ব মেধা, জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন সর্ব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর অকাল প্রয়াণ এলাকাবাসী তথা দেশ ও জাতি হারিয়েছে এক আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমিক, নির্ভরশীল অভিভাবককে।

আমরা এলাকাবাসী তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। পরম করুণাময় রহমানুর রহিম যেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান মহোদয়ের ত্যাগকে কবুল করেন এবং জান্নাত দান করেন। আমীন। তাঁর শূন্যস্থান দেশ তথা আমরা এলাকাবাসী হয়তো বা পূরণ করতে পারব না বা করলেও অনেক প্রজন্মকে অপেক্ষা করতে হতে পারে। পরিশেষে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলীর পরিবারকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন! ছুম্মামীন! ওয়াও আখিরুদাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহির রাব্বিল আলা-আমীন!

(লেখক : উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ অফিসার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।)

বাবার বন্ধু ডা. মোঃ ইউনুস আলী খান

Layina Zaman. (নোট : নামটি বাংলা বানানে কী হবে?)

ডাঃ মোঃ ইউনুস আঙ্কেলের সাথে প্রথম পরিচয়ে আমার মনে হয়েছিল, তিনি একাধারে যেমনি শান্ত, সৌম্য এবং দৃঢ় ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন তেমনি ভীষণ অমায়িক ও সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ। পরিচয়ের ধারাবাহিকতায় জানতে পারি, উনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। যেহেতুআমার বাবাও একই মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করেছেন, আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে প্রকাশ হলো, আমার বাবা উনার অতি পরিচিত এবং ঘনিষ্ট বন্ধু। তাঁরা দুজনে একই হোস্টেলে পাশাপাশি রুমে কাটিয়েছেন পাঁচটি বছর, একই সাথে করেছেন একই ছাত্র সংগঠন।

উনাকে প্রথমেই আঙ্কেল বলে সম্মোধন করি। কারণ, উনি আমাদের অনেক দিনের ঘনিষ্ট ও পারিবারিক বন্ধু ডাঃ ইসমত পারভীন আপার বাবা। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আমরা একই শহরে আছি। আপার ছেলে ঋষি ও আমার মেয়ে লামিয়া ছোটবেলা থেকে একই সাথে একই স্কুলে পড়াশুনা করছে। ছোটবেলাতেই আমি আমার মাকে হারিয়েছি। আমার বাবাই আমার সবকিছু। ছোটবেলায় বাবাকে ডাকতাম আব্বু বলে, সময়ের সাথে ডাকটাও পরিণত হয় আব্বা ডাকে। দীর্ঘদিন আব্বাকে ছাড়া প্রবাসে রয়েছি। প্রতি মুহূর্তে আব্বার জন্যে মনটা ভীষণ আকুল থাকে। তাই হয়তো আব্বার এত কাছের বন্ধুকে পেয়ে, আঙ্কেলকে নিজের অজান্তেই মনের এক বিশেষ জায়গায় বসিয়ে ফেলেছিলাম। গভীর শ্রদ্ধা ও ভালো লাগায় আমার মনটা সেদিন ভরে উঠেছিল। এরপর নতুন করে শুরু হলো এতদিন পর খুঁজে পাওয়া দুই বন্ধুর যোগাযোগ, পৃথিবীর দুই প্রান্তে বসে। দুই পক্ষের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আমিও উচ্ছ্বসিত হই। কত গল্প, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তাদের! আব্বাকে জিজ্ঞেস করি কবে আসবে আবার? বলতেন, এবার ইউনুস ভাই যখন যাবে তখন আসব ইনশাল্লাহ। আমি ভাবি, যাক, এবার হয়তো আব্বাকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারব। দেখতে দেখতে এভাবেই দুইটি বছর কেটে গেল। আমার বাবাও সবকিছুর মায়া ছেড়ে চলে গেলেন। দুই বন্ধুর আর দেখা হলো না।

আব্বা চলে যাওয়ার পর থেকে যতবারই আমি আঙ্কেলকে দেখেছি, ভীষণ কষ্ট পেতাম এই ভেবে যে, আহা, আব্বা কতই না আকুল ছিলেন আঙ্কেলের সাথে দেখা করার জন্য। আজ আর কোনো বাঁধা নেই, দুই বন্ধু একই গন্তব্যে পৌঁছেছেন। আঙ্কেল

যে আমাকে প্রচণ্ড স্নেহ করতেন সেটা বুঝতে পারতাম যখন উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে 'মা' বলে ডাকতেন। মনে হতো যেন আব্বা আমার মাথায় হাত বুলালেন। আব্বার ছায়া আমি ইউনুস আঙ্কেলের মধ্যে দেখতে পেতাম।

আঙ্কেলের প্রতিটি কথায় ভীষণ শান্তি পেতাম। যেদিন শুনলাম, আঙ্কেলকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে, উনি করোনায় আক্রান্ত, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। মন বলছিল, উনি শিগগির সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন। হয়তো এটাই বিধাতার নিয়ম, তাইতো ভালো মানুষগুলো এত আকস্মিকই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। শেষবার যখন ওকালাতে এলেন, আমার মনে হয়েছিল আঙ্কেলের শরীর কিছুটা ভেঙে পড়েছিল। দেখতে গিয়েছিলাম আমার মেয়েকে নিয়ে। অনেকটাই চুপচাপ ও অন্যমনস্ক ছিলেন। অজানা ভয় মনে উঁকি দিয়েছিল বারবার! কিন্তু পর মুহূর্তেই তা উড়ে গেল যখন দেখলাম একদম শিশুদের মতো ঋষি আর লামিয়াকে নিয়ে লুডুখেলছেন। বিদায় নেওয়ার সময় বললেন, দোয়া করো, জানি না আর দেখা হয় কি না! হায়, আর দেখা হলো না! ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান, আমার দেখা একজন নিরহঙ্কার, পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। আমার অতীব শ্রদ্ধাভাজন, একান্ত আপন, পিতৃতুল্য একজন। মহান রাব্বুল আল-আমিন উনাকে জান্নাতবাসী করুন। আমাদের সবার মনে তাঁর স্মৃতি চিরতরে অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

(লেখক : Ocala, Florida , USA

ডাঃ মোঃ ইউনুস : মানুষের কাছের মানুষ

শফিক আহমেদ

জন্মগ্রহণ ভাগ্যের ব্যাপার, মৃত্যুবরণ সময়ের ব্যাপার। কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানুষের মাঝে বেঁচে থাকাটা কর্মের ব্যাপার। যে কজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব আমাদের গৌরবময় শাহজাদপুরে তাঁদের কর্ম এবং মহত্ব দিয়ে নিজেকে মহিমান্বিত করেছেন, জয় করেছেন হাজার মানুষের হৃদয়, তাঁদের একজন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। আমাদের সবার পরিচিত এবং প্রিয় ইউনুস কাকা।

ইউনুস কাকা ছিলেন আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক, একজন গাইড এবং মাইলফলক। সম্ভবত ১৯৭২ কিংবা ১৯৭৩ সালের কথা, যখন আমার বয়স পাঁচ কিংবা ছয়। আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এক বিকেলে সপরিবারে এক ভদ্রলোকে এলেন। জানলাম, তিনি নতুন এসেছেন শাহজাদপুরে, পেশায় ডাক্তার। নাম ডাঃ মোঃ ইউনুস। ধীরে ধীরে সেই নাম আর ডাঃ মোঃ ইউনুস সাহেবের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদের ইউনুস কাকা বা ডাক্তার কাকা।

আমার বাবা ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভক্ত। সারিবাদি সালসা আর চ্যাবনপ্রাশ থেকে শুরু করে পঞ্জিকা দেখে উপবাস করা--কোনোটাই বাদ দিতেন না। একদিকে হিন্দু পুরাণ অন্য দিকে ফার্সি বয়ান--শেখ সাদি, মির্জা গালিব কিংবা জালাল উদ্দিন রুমীর শের নিয়ে আলোচনা করতে বড্ড ভালবাসতেন। সামান্য ঠান্ডা কিংবা কাশিতে প্রায়ই বেশ কাতর হয়ে পড়তেন আমার বৃদ্ধ বাবা। শুধু কাতর হওয়াই নয়, বরং সেই অসুখই যে তাঁর জীবনের শেষ অসুখ, প্রতিবারই সেটা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতেন আমার মাকে। আমি তখন অনেক ছোট। দেখতাম বাবা অসুস্থ হলেই আমার বড় ভাইয়েরা ছুটতেন ডাক্তারের কাছে। পিতার নির্দেশ ছিল, যেনতেন ডাক্তার এলে চলবে না। আনতে হবে ডাঃ মোঃ ইউনুসকে। ডাক পড়ত ইউনুস সাহেবের। বাবা বিছানায় শুয়ে, মা হারিকেনের আলো জ্বালিয়ে অপেক্ষা করতেন, আমরা অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে পড়তাম, ঘুমিয়ে পড়ত পুরো শাহজাদপুর। গভীর রাতে অন্ধকার ভেদ করে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠত--"মঞ্জু কি জেগে আছো?" মোহন কাকার গলার আওয়াজে প্রাণ ফিরে পেত আমাদের নিস্তব্ধ বাড়িটা। মোহন কাকা ছিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস সাহেবের ডিসপেন্সারির কম্পাউন্ডার। চেম্বারের সমস্ত রোগী দেখা শেষে মোহন কাকাকে সঙ্গী করে মধ্যরাতে তিনি (ডাঃ মোঃ ইউনুস) বেরিয়ে পড়তেন শাহজাদপুরবাসীর সেবায়। কোনো এক পৌষের রাতে আমার বাবা বেশ অসুস্থ। খবর দেওয়া হয়েছে ইউনুস কাকাকে। মা জেগে বসে আছেন, বড় ভাইবোনেরা সবাই বাবার

শয্যার কাছাকাছি বসে অপেক্ষমান, কখন আসবেন তিনি। বাবা ব্যথায় কাতর, মা ধরা গলায় আমার ভাইকে বলছেন "ও মঞ্জুদেখ না ডাক্তার সাহেব দেরি করছেন কেন?" শীতের রাতে লেপের নিচ থেকে মুখ বের করে আমি তাকিয়ে দেখি, হারিকেনের আলোয় কাঁপছে ভিতরে বসে থাকা মানুষের ছায়া, যেন অশরীরী প্রেতাত্মা সব। ভয়ে আমি আবার মুখ গুঁজি লেপের ভিতর। হঠাৎ অন্ধকার চিরে মোহন কাকার সেই ডাক, "মঞ্জু কি জেগে আছ?"--আমার ছোট্ট শিশু মনেও প্রাণের সঞ্চার করে। মুহূর্তের মধ্যেই যেন প্রাণ ফিরে পায় থমকে যাওয়া সময়। অশরীরী প্রেতাত্মার মতো ছায়াগুলো সব নড়েচড়ে বসে। ত্রস্তপায়ে ঘরে ঢোকেন সৌম্য, শান্ত, ক্লান্তিহীন ছুটে চলা ডাঃ মোঃ ইউনুস। লেপের নিচ থেকে মাথা বের করে আশার আলো দেখি আমি, দেখতে পাই যেন এক মিডনাইট এঞ্জেলকে (A midnight Angel)। আমার রুগ্ণ পিতার নাড়ি টিপে, স্টেথো দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করে ঘোষণা দেন চিন্তার কিছু নেই, ঠিক হয়ে যাবেন এ যাত্রা। ডাঃ ইউনুসের কথা শুনে উঠে বসতে চেষ্টা করেন আমার রুগ্ণ দুর্বল পিতা। বিশ্বাস! অসম্ভব শক্তি এই বিশ্বাসের। এই বিশ্বাসের ভিত হলো সততা আর নির্ভরতা।

একজন চিকিৎসকের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা যখন প্রশ্নাতীতভাবে রোগীর বিশ্বাসে স্থান করে নেয়, তখনই ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে তৈরি হয় এক অপার্থিব আত্মিক সম্পর্ক। সেই আত্মিক সম্পর্কের কারণেই বোধ করি মৃত্যুশয্যাতেও রোগী স্বস্তিবোধ করেন। ক্ষীণ, দুর্বল শরীরেও রোগী উঠে বসতে চেষ্টা করেন সেই চিকৎসককে দেখে, যার চিকিৎসা নৈপুণ্যের ওপর জন্মেছে তার অগাধ বিশ্বাস। সময়ের আবর্তনে শাহজাদপুরের হাজারো মানুষের হৃদয়ে ডাঃ মোঃ ইউনুস স্থান করে নিয়েছিলেন তাঁর দক্ষতা, জ্ঞান, সহানুভূতি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে। একজন রোগী ও তাঁর পরিবারের কাছে ডাঃ মোঃ ইউনুস সাহেবের লেখা প্রেসক্রিপশন আর দশজন ডাক্তারের লেখা প্রেসক্রিপশনের মতো শুধুমাত্র একটা প্রেসক্রিপশন হিসাবে গণ্য হতো না। তাঁদের কাছে প্রেসক্রিপশন নামক কাগজের সেই টুকরোটি ছিল যেন রোগমুক্তির সনদ। নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর সততার মাধ্যমে মানবমিত্র এই ডাক্তার নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একটা ব্র্যান্ড হিসেবে। ডাঃ মোঃ ইউনুস শাহজাদপুরের মানুষের কাছে শুধুই একজন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, যার ওপরে নির্ভর করা যেত, বিশ্বাস করা যেত। তাই রোগী এবং তার আত্মীয়-স্বজন যখন ডাঃ মোঃ ইউনুস সাহেবের লেখা কোনো প্রেসক্রিপশন হাতে নিতেন, সেটা তাঁদের কাছে গণ্য হতো একটা ব্রান্ডেড প্রেসক্রিপশন হিসেবে। যার সাথে জড়িয়ে থাকত রিলায়েবিলিটি (Reliability) যা তাঁকে আর দশজন ডাক্তার থেকে আলাদা করেছিল।

ডাঃ মোঃ ইউনুস চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মানুষের খুব কাছে চলে এসেছিলেন। কখনই তিনি গণমানুষকে উপেক্ষা করে উপরে উঠতে চাননি, চিকিৎসার মতো মহান এবং সেবামুলক পেশাকে নিয়ে বাণিজ্য করেননি। বরং সমস্ত লোভ লালসার

ঊর্ধ্বে উঠে আত্মনিয়োগ করেছিলেন জনগণের সেবায়। যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিলেন গণমানুষের হৃদয়-মঞ্চে। এখানেই তিনি অনন্য। আর তাই প্রয়াণের পরেও ব্যতিক্রমী এই মানুষটি হারিয়ে যাননি। বেঁচে আছেন তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে সমগ্র শাহজাদপুরবাসীর হৃদয়-আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে।

টরন্টো, কানাডা
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

স্মৃতিতে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

আতিক সিদ্দিকী

সকল মৃত্যুর অভিব্যক্তি কান্না। স্বজন প্রিয়জনকে কাঁদিয়ে সবাইকে চলে যেতে হবে না ফেরার দেশে। সামাজিক অবদান যে যত বেশি রেখে যায়, তাকে ঘিরে শোকের চিরন্তন স্মৃতি ততই ব্যাপকতা লাভ করে। এ কারণেই অভিব্যক্ত কান্নার ব্যাপ্তিতে রয়েছে পার্থক্য। মৃত্যু মানুষকে কাঁদায়, কাঁদায় মানুষের বোধকে। জাগ্রত করে লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশকে। মৃত্যুর এমন অনিবার্য পরিণতির জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে হয়। এ কথা কে না জানে প্রাণীজগতের প্রতিটি জীবকোষকেই মৃত্যুল স্বাদ নিতে হয়। নিয়তির এমন স্পষ্ট অধ্যায়ের পাঠজ্ঞান সবারই নেওয়া আছে। তারপরও মৃত্যুকে মেনে নিতে না পারার এমন আবেগ আপনাকে কোনোভাবেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সকল মৃত্যুর আবেগ অশ্রুজল নোনা এবং অভিন্ন অনুভূতির। এ কথা পাশাপাশি বলতেই হবে সকল মৃত্যু সার্বজনীন নয়। তবে কিছু কিছু মৃত্যু সার্বজনীন অভাববোধকে জাগিয়ে তোলে তেমনই এক মৃত্যুর কথা বলছি আমাদের শাহজাদপুরের নন্দিত চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। তাঁকে নিয়ে কিছুস্মৃতি রয়েছে আমার, যেগুলো এ নিবন্ধে উল্লেখ করলাম। পোতাজিয়া হাসপাতালে ঢুকতেই রাস্তার বাম পাশে পাশাপাশি দুটি বাসার পশ্চিমের কোয়াটারটিতে থাকতেন প্রিয় চিকিৎসক প্রিয় ব্যক্তিত্ব ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। তার আগে একটুবলে নিই, এই পোতাজিয়া গ্রামেই আমার বাড়ি। আমার মরহুম পিতা আজিজুল হক একসময় শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেড়া বিবি হাই স্কুল, পাবনা আরএম একাডেমি ও জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ছিল তার সর্বশেষ কর্মস্থল। বাবার সাথে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের ভালো পরিচয় এবং সখ্যতা ছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন মোহন, মোজাম্মেল হক মাস্টার, অনন্ত কুমার গোস্বামী (অনুমাস্টার), বদরোদ্দৌজা মিয়া ওরফে বদর মিয়া, বিবেকানন্দ ঘোষ ওরফে কনক বাবু, রাউতারার অনীল কুমার ঘোষ ওরফে কর্ত্তা বাবু এদের সাথে ডাক্তার সাহেবের বেশ সুসম্পর্ক ছিল। এ ছাড়াও আরও অনেকেই ছিল নাম উল্লেখ করতে গিয়ে লেখাটা বড় করতে চাই না। তবে যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করতে পারলাম না, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে গেলে এদের নিয়মিত দেখা মিলত। আড্ডার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল ঘন ঘন চা-বিস্কুট, পান-সিগারেট আরও অনেক কিছু। ডাক্তার সাহেব প্রায় বিরামহীন ধূমপায়ী ছিলেন। এসবের কিছুই খেতেন না কর্ত্তা বাবু।

নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, এত দীর্ঘ আড্ডায় আলোচনার বিষয় কী ছিল। আলোচনার বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ। বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিল তাঁর চিন্তা-চেততা আর রাজনীতি। বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক শেখ মুজিব ও তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের নানা কর্যক্রম আলোচনার উপজীব্য বিষয় হিসেবে তাঁদের আড্ডার বেশির ভাগ জায়গাজুড়ে থাকত। দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার মানসিকতা ছিল উল্লেখ করার মতো। সদালাপী, ধৈর্যশীল, হাসিখুশি একটা মানুষ ছিল আমাদের ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। আমাকে সাথে করে আমার ভাই আব্দুল খালেক আমার মরহুম পিতা আজিজুল হক আসলেন ডাক্তার সাহেবের বাসায়। যে বাসার কথা আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি। দক্ষিণমুখী বাসার পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে আমাদের ঢুকতে হলো তাঁর বাসায়। মনে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা ছিল প্রচুর, তার মধ্যেও খেয়াল করেছিলাম বাসার এই চেম্বারের পশ্চিম দেয়ালে একটি সাদাকালো একটি পোর্টেট। স্বাধীনতার স্মৃতিবিজড়িত দুর্লভ আলোকচিত্র যেখানে কয়েকটি শকুন মানুষের লাশ খামছে ধরেছে, আশপাশে শহীদদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। শহীদদের ফসিল ৭১'র মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার নির্মম ও নৃশংসতার বার্তা বয়ে বেড়াচ্ছে এই দুর্লভ চিত্রটিতে। এর চেয়ে বেশি মনে পড়ছে না। এখন বোধ হয় বলা প্রয়োজন, কেন গিয়েছিলাম ডাক্তার সাহেবের কাছে। নুকালী মাঠে ফুটবল খেলা মণা ঢুলি বেশ মজা করে বাঘে-সিংহের লড়াই--এই বলে বৃহস্পতিবার সকাল এবং বিকেলে ঢেরা (ঢাক) পিটিয়ে গেল। হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত নুকালী মাঠের সে খেলায়। আমি নিজেও বাঘ-সিংহের এ লড়াই দেখতে গিয়েছিলাম। স্বাধীনতার অববাহিত পর। খেলা শেষে সন্ধ্যে গড়িয়েছে মাত্র। নুকালী থেকে আল পথে সোজা পশ্চিমের গ্রাম পোতাজিয়ায় নিজ বাড়িতে ফিরছিলাম। চরায় মাত্র (ফসলের মাঠ) বানের পানি ঢুকেছে। পাট, তিলসহ মাঠের মৌসুমি ফসল কাটা হয়ে গেছে। মেঠো পথে হাঁটার তেমন অভ্যেস না থাকায়, সঙ্গী-সাথিদের পিছুপড়ছিলাম। চলার পথ ছিল কাঁদাপানিতে মোটামুটি পিচ্ছিল। একসাথে হতে মাঝেমধ্যেই খানিকটা দৌড়ের মতো পা টেনে চলতে হতো বারবার। একবার পড়ে গেলে তিলে গোঁজা (সদ্য কেটে নেওয়া তিল গাছের অবশিষ্ট অংশ) আমার বাম পায়ে ঢুকে যায়। তখন ক্ষতটা তত জটিল কিংবা মারাত্মক মনে হয়নি। দুই-তিন দিনের মধ্যে আমার পা ফুলে পেঁকে হাতির পায়ের মতো হয়ে যায়। নানা জনে নানা কথা বলতে শুরু করেছে। কেউ বলছে মুখ দোষ করেছে, কেউ বলছে বোরার বিশ লেগেছে। গ্রামে যশ-খ্যাতি আছে এমন একজন অশিক্ষিত গ্রামের ডাক্তার বলছেন, ওষুধ দিলাম খাওয়ান তবে পরিস্থিতি বেশি খারাপ হলে শহরে নিয়ে যেতে হতে পারে। নাম প্রকাশ করতে চাই না, তবে তিনি খান সাহেবকে অর্থাৎ ডাক্তার ইউনুস আলী খানকে যে ভালো চোখে দেখতেন বলে মনে হয়নি। যাই হোক আকারে-ইঙ্গিতে তিনি পা কেটে ফেলতে হতে পারে এমন মন্তব্যও করতে ছাড় দিলেন না। এমন সব কথায় পরিবারের অপর সদস্যদের তেমন চিন্তা

করতে না দেখে আমি ভীষণ ক্ষিপ্ত হলাম। তাঁদের প্রতি আমার অভিযোগ, আমার কেন চিকিৎসা করা হচ্ছে না। আমার বয়স তখন আর কত হবে ১০ অথবা ১১ বছর। বাম পায়ে ক্ষত, ডান পায়ে গাছ বাধা। তেল-পানি, তাবিজ-কবজ কত কী? তবে এতে আমি খুশি ছিলাম না। একদিন প্রতিবেশী এক দাদার পরামর্শে বোরা বিশ নামাতে কাঁচি দিয়ে মাটিতে ফাঁক আর রাতভর জাগ (এক ধরনের ধুয়া গান) গাওয়ানো হলো। বাড়ির উঠানে ২০ থেকে ২৫ জন লোক। এরা সবাই সারিন্দা। বাড়ির লোকজন মিলে প্রায় ৫০ জন লোকের খিচুড়ির আয়োজন হলো। আমি অসুস্থতা আর দুশ্চিন্তায় কাতর হলেও বোরার বিষ নামানোর উপহাস-আয়োজন বেশ উপভোগ করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, এদিন ছিল সোমবার রাত। আঘাত পেয়ে ১৩ দিন অতিবাহিত হয়েছে। কোনো কিছুতেই যখন পায়ের ক্ষত সারছিল না। ক্রমেই বাড়ছিল এমন এক সময় আব্বার ইচ্ছায় একদিন সকালে পোতাজিয়া হেলথ কমপ্লেক্সে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। আমি ভয়ে কাঁপছি। ওনার হাতের ডানপাশে থাকা রোগী দেখার টেবিলটাতে শুইয়ে দিলো সবাই। ডাক্তার সাহেব দেখেই আব্বাকে বললেন, আরও কয়েকদিন আগে আসতে হতো। যাই হোক, পায়ে তিন জায়গায় তিনি কাটলেন (ইনসিশন)। প্রায় মাঝারি একটি কিডনি ট্রে পরিমাণ কালেকশন (পুঁজ) বেরিয়ে পা সেই সময়েই বেশ হালকা হয়ে গেল। সার্জিক্যাল গজ ঢুকিয়ে দিয়ে পর পর এক সপ্তাহ ড্রেসিং করিয়ে ছিলেন। এর আগে অবশ করার ইনজেকশন দিয়ে নিয়েছিলেন। অপারেশনের পর আমার সকল সংশয়-আতঙ্ক কেটে স্বস্তি ফিরে এলো। দুই সপ্তাহের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে পা স্বাভাবিক হয়ে গেল। এখনও আমার বাম পায়ে সে ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ডাক্তার সাহেবের স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেসময় এমন সঠিক চিকিৎসা না হলে পরিণতির কথা ভেবে এখনও শিউরে উঠতে হয় আমাকে। এটি একটি ঘটনা।

এখন দ্বিতীয় যে ঘটনা মনে পড়ছে, সেটি হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের পরোপকার বা সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। এখন ভাবলে এমনটাই মনে হয় যে মানুষ হিসেবে কতটা ভালো মানুষ ছিলেন আমাদের প্রিয় ডাক্তার সাহেব। আমার পড়াশোনায় তেমন মনোযোগ ছিল না কখনও, এখনও নেই। বাউন্ডুলে স্বভাবের ঘুড়ে বেড়ানোয় খুব মজা পেতাম। এমন স্বভাবে বার দুয়েক এসএসসি পরীক্ষা না দেয়ায়, আব্বা খুব রেগে গিয়ে মাকে বললেন, তোমার ছেলে যে আমার বাপ (বুড়ো) হয়ে গেল! মা থামিয়ে দিয়ে বলল, এবার ওকে পরীক্ষা দিতেই হবে। বুঝতে পারলাম, আর যাই হোক এবার অন্তত পরীক্ষা এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। আব্বা তখন জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার, আর আমি ওই বিদ্যালয়ের খাতায় নাম ওঠানো গবেট ছাত্র। আমার এসএসসি পরীক্ষা হবে সিরাজগঞ্জ আইআই কলেজ কেন্দ্রে। সমস্যা দেখা দিল, পরীক্ষাকালীন সময় সিরাজগঞ্জে থাকা-খাওয়া নিয়ে। তাইতো কোথায় থাকা হবে। যাই হোক আব্বা আমাকেই পাঠালেন আমাদের গ্রামের বাড়ি পোতাজিয়াতে। আব্দুল খালেক নামে আমার এক ভাই আর আমি বদর মামাকে সাথে নিয়ে ডাক্তার সাহেবের

শাহজাদপুরের চেম্বারে দেখা করলাম। ডাক্তার সাহেব সমস্যা শুনে এক কথায় সিরাজগঞ্জ চক্ষুহাসপাতালের একজনকে দুই কলম চিঠি লিখলেন। কাকে লিখলেন এবং দিন-ক্ষণ এখন মনে করতে পারছি না। সিরাজগঞ্জ চক্ষুহাসপাতালের পূর্বদিকে বড় পরিসরের চমৎকার একটি রুম দেখিয়ে দিয়ে বলা হলো, তুমি এখানে থেকে যতদিন প্রয়োজন পরীক্ষা দেবে। হাসপাতালের আযম নামে এক কর্মচারী আমার বেশ খোঁজ-খবর নিতেন। এই আযম সাহেব আমার দেখভালে এতটা আন্তরিকতার কারণ ছিল, স্যার (ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান) যাতে খুশি হন বা কিছুমনে না করেন। ওই এতটা ছোট বয়সেই বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি, কতটা ক্ষমতা এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন আমাদের ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান।

বড় পরিসরের খোলামেলা এই রুমটিতে পরীক্ষার কয়েকটা দিন বেশ ভালই কেটেছিল আমার। এ সময় হাসপাতালের আরও যাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল বা আত্মিক বন্ধনে বেঁধেছিল, তাঁদের নাম আজ আর আমার মনে পড়ছে না। যাই হোক, তিনি আমাদের পরিবারের প্রায় সকলেরই চিকিৎসক ছিলেন। বিশেষ করে আমার মা। ঢাকায় নেন আর এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন, যত বড় হাসপাতাল আর যত বড় ডাক্তার দেখান ইউনুস ডাক্তারকে না দেখালে অসুখ সারবে না। মাকে ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হলেই ডাঃ মোঃ ইউনুস খানের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। আমাদের জন্য বিশেষ করে আমার মাসহ পরিবারের সকলের চিকিৎসার জন্য একটা নির্ভরতার প্রতীক ছিল ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। জীবনের শেষ সময়টাতে মা আমার শেরখালীর বাসায় আমার কাছেই থাকতেন। আমার মা... তারিখ... টার সময় ডাক্তার সাহেবের দ্বারিয়াপুরের সেকেন্দার এক্সরে এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আব্বার মৃত্যুর ...বছর পর মারা যান। (নোট : ...শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে)

শৈশবে আমার ব্যাক্তিগত চিকিৎসা, এসএসসি পরীক্ষার সময় সিরাজগঞ্জ চক্ষুহাসপাতালে থাকবার ব্যবস্থা, মাকে নিয়মিত চিকিৎসা এবং তাঁর ক্লিনিকেই আমার মায়ের মৃত্যু স্যারকে আমাদের পরিবারের একান্তজন হিসেবে মনে হয়েছে। সাংসারিক অভাব-অনটনকে বিবেচনা করেই স্যারের পরামর্শে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা করেছিলাম। সস্ত্রীক সরকারি চাকরির শেষের দিকে এসে শেরখালীতে নিজ বাসায় আছমা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার (এসিডিপি) গড়ে তুললাম। শাহাজাদপুরের সবগুলো ক্লিনিক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার মিলে সংগঠন করা হলো, তখন সবাই মিলে স্যারকে সভাপতি করা হলো। ক্লিনিক পরিচালনায় নানা বিষয়ে স্যার পরামর্শ দিয়েছেন। এ সময় স্যারের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। মা যেদিন মারা যান, সেদিন মাকে তাঁর শেষ ইচ্ছেতেই ডাঃ মোঃ ইউনুস খানের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

শাহজাদপুরের প্রবীণ চিকিৎসক ও রাজনীতিক সেকেন্দার এক্সরে এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী সবার প্রিয় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান করোনা

আক্রান্ত হয়ে গত..... তারিখ (নোট : ..... শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে) বুধবার সকাল ১০টার দিকে সবাইকে কাঁদিয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে স্যারের বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী, আমেরিকা প্রবাসী তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল অফিসার ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। চাকরিরত অবস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, রোগীদের সেবা ব্যহত হবে এমন কথা ভেবে একসময় সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। প্রায় ৬০ বছর আগে চিকিৎসক হিসেবে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এসেছিলেন সবার প্রিয় মানুষ ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। শাহজাদপুর ও তার আশপাশের অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার রোগীর সেবাদান করে ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি। আন্ধারকোঠা মহল্লায় নিজ বাড়ি এবং দ্বাড়িয়াপুর বাজারে নিজ ব্যবসায়িক চেম্বার গড়ে তুলে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেছেন। শাহজাদপুরে তার দীর্ঘ অবস্থানকালে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শাহজাদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং শাহজাদপুর বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। .....তারিখ (নোট : ..... শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে) বৃহস্পতিবার রাতেই নামাজে জানাজা শেষে পাবনা জেলার সদর উপজেলার দুবুলিয়া কাটিপাড়া গ্রামে জন্ম নেয়া এই চিকিৎসকের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর গ্রামের বাড়িতে বাবা-মায়ের কবরের পাশে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন।

এমন গুণীজনের প্রয়াণে চোখের জল সবার সঙ্গী হবে এমনটাই তো স্বাভাবিক। আমিও তাঁর সংবাদে অঝোরে চোখের জল ফেলেছি। আমার সহধর্মিণী ডাঃ আছমা সুলতানা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে বলছে, শুনেছ কি ইউনুস আলী খান স্যার মারা গেছেন। তাঁর কাছেই প্রথম স্যারের মৃত্যুসংবাদ পাই। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আমাদের মাঝে আর কোনোদিন আসবে না জানি, কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড-অবদান বিশেষ করে পরোপকার স্মৃতি হয়ে থাকবে হাজার বছর।

(লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট)

শাহজাদপুরের ইউনুস ডাক্তার

মো. আসাদ উল্লাহ তুষার

আমার ধারণা, শাহজাদপুর তথা এ অঞ্চল বা আশপাশের উপজেলার সমস্ত মানুষই তাঁকে এক নামে চেনেন। তিনি সদ্য প্রয়াত শাহজাদপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'শাহজাদপুরের ইউনুস ডাক্তার' নামে বলে পরিচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। দীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি শাহজাদপুর তথা আশপাশের বিভিন্ন উপজেলার মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি দল-মত নির্বিশেষে সকল পেশার, সর্বস্তরের মানুষের কাছে একজন শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি শুধু একজন স্বনামধন্য চিকিৎসকই ছিলেন না, ছিলেন একজন সমাজসেবক, রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইউনুস ডাক্তারকে চিনি আর সবার মতোই একজন সুপরিচিত স্বনামখ্যাত ডাক্তার হিসেবে। কিন্তু তাঁর চেম্বারে জীবনের প্রথম যখন যাই, সেটা ৮০-এর দশকের শেষের দিকে কোনো রোগী বা কোনো রোগীর গাইড হিসেবে না। আমি স্কুল ছাত্র অবস্থায় তার চেম্বারে গিয়েছি একই ফ্রেমে তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ছবি বাঁধানো ছিল, সেটা দেখতে গিয়েছি। তখন তাঁর চেম্বারে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ঠিক যেখানে বসতেন, ঠিক তাঁর পিছনে সেই কৌতূহলোদ্দীপক ছবিটি টাঙানো থাকত। সামনে থেকে দেখলে দেখা যেত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দুই পাশ থেকে দেখা যেত যথাক্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবি। একই ফ্রেমে তিন জন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখতে আমি প্রথমে তাঁর চেম্বারে যাই এবং পরবর্তী সময়ে ওই একই উদ্দেশ্যে আরও অনেকবার যাই। একই ফ্রেমে তিন পাশ থেকে তিনজনের ছবি দেখা ইউনুস ডাক্তারের চেম্বারে দেখা ছাড়া আর কোথাও এ রকম ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

তাঁর সাথে যে আমার তেমন ব্যক্তিগত জানাশোনা না, বলা চলে কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কারণটা ছিল ৯০-এর দশকের শুরুতে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে এবং পরে কাজের জন্য শাহজাদপুরের বাইরে যেতে হয়েছিল। সেই কারণে কিনা তাঁর সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে। নিজে রোগী হিসেবে তাঁর সেবা গ্রহণ করার সুযোগ সংগত কারণেই হয়ে ওঠে নাই। কিন্তু আমার পরিবারের বিশেষ করে আমার আব্বা মার ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসার জন্য একজন ভরসার মানুষ ছিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। রাজনৈতিকভাবে তিনি যে চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন, আমিও ওই একই চিন্তাধারার মানুষ হিসেবে বা ছাত্রকর্মী হিসেবে ৯০-এর দশকে তাঁর সাথে চলাফেরা করার কিছুটা সুযোগ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার সেই চলাটা তাঁর

সাথে হয়ে ওঠে নাই। কিন্তু সব সময় তিনি আমার বা আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। আর ডাক্তার হিসেবে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। শাহজাদপুরের প্রায় প্রতিটি মানুষ বা প্রতিটি পরিবার কোনো না কোনোভাবে তাঁর চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি প্রায় সবার কাছে ছিলেন সমান গ্রহণযোগ্য। একটা ভরসার স্থল ছিলেন রোগীদের কাছে। সবাই ভেবেছেন ইউনুস ডাক্তারের কাছে গেলে রোগী ভালো হয়ে যাবে। একটা ভালো চিকিৎসা তাঁর থেকে মানুষ পেয়েছেন। রোগীর টাকা পয়সা নিয়ে কোনো সময় চিন্তা করতে হতো না। তাঁর ফি তেমন ছিল না যে মানুষ তা দিতে পারবে না। আর যদি কেউ নাই দিতে পারত বা আর যে যাই দিতেন তিনি হাসিমুখে তাই নিয়ে নিতেন। কিন্তু চিকিৎসা না দিয়ে বা টাকার অভাবে কেউ কোনোদিন ফিরে গেছেন, এমনটা কেউ বলতে পারবে না। গরিব রোগীরা টাকার অভাবে তাঁর কাছ থেকে বিনা চিকিৎসায় ফিরে আসতেন না। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন গরিবের ডাক্তার। যে কারণে তাঁর মৃত্যু শাহজাদপুরবাসীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি, এই ক্ষতি শাহজাদপুরের প্রতিটি পরিবারে অনুভব করছে এবং আরও অনেক দিন করতে হবে। একজন মানুষ হিসেবে একজন চিকিৎসক হিসেবে এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

তাঁর জন্ম হয়েছিল আমাদের পাশের পাবনা জেলার সুজানগর থানায়। কিন্তু এটা আমি জানতাম না, ঠিক তেমনি অনেক মানুষই হয়তো জানতেন না। কারণ, তিনি শাহজাদপুরের মানুষকে এতটা আপন করে নিয়েছিলেন যে ঠিক তাঁর মৃত্যুর পরে জানতে পারলাম যে, তাঁর বাড়ি সুজানগর থানার কোন গ্রামে। কারণ মৃত্যুর পরে তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী কবরস্থ করতে হয়েছে সেই গ্রামে মায়ের কাছে, যেখানে মৃত্যুল পরে সবাই ফিরে যেতে চায়। এটাও তাঁর জন্মভূমির প্রতি তার একটি বিরাট টান।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে আমার ছোট্ট একটি দুর্ঘটনায় যখন ডান পাটা মচকে গিয়েছিল, তখন আমি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমার সাথে আমার যেসব রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন বা বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, তাঁরা সবাই মনে করেছিলেন ইউনুস ডাক্তারের সাথে হয়তো আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় আছে। ভাবাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, তিনি আমাকে চিনতেন না। চিকিৎসা শেষে আমি ফি দিতে গেলাম, তখন তাঁর চেম্বারে উপস্থিত সবাই সমস্বরে ফি না দিতে উৎসাহিত করলেন। ব্যাপারটা এমন ইউনুস কাকার কাছে দেখিয়ে আমাকে ফি দিতে হবে কেন? ইউনুস কাকা আমতা আমতা করে বলতে লাগলেন, না ফি দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু আমি এই বিষয়টা বুঝে ব্যাখ্যা করে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, কাকা পেশেন্ট হিসেবে আমি আপনার চেম্বারে প্রথম তাই কিছু টাকা আপনাকে নিতে হবে। পরিচয় দেওয়ার পর উনি চিনলেন এবং অভ্যাসবশতভাবে অনেক গল্প করলেন। সেটাই ছিল ইউনুস ডাক্তারের সাথে আমার সামনাসামনি প্রথম এবং শেষ দেখা। কিন্তু তাঁর চেম্বারে কিংবা

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দূরে বা কাছ থেকে তাঁকে অনেকবার আমি দেখেছি। তাই তিনি অন্য আরও দশ জনের মতো আমার কাছেও ছিলেন অতি আপনজন। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল না এটা যেমন সত্য, কিন্তু তিনি অপরিচিত ছিলেন না বরং ছিলেন অতি আপনজন, নিকটজন। তাই তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছি, মন খারাপ হয়েছে। আর তাঁর মৃত্যুল সংবাদ শুনে হৃদয় ভেঙে গিয়েছে, স্বজন হারানোর বেদনা অনুভব করেছি। যে বেদনা হয়তো শাহজাদপুর তথা সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার অনেক মানুষই অনুভব করেছেন।

এমন কর্মবীর মানুষের মৃত্যু হয় না, তাঁরা মানুষের ভালোবাসায় সারা জীবন বেঁচে থাকেন।

(লেখক: সাংবাদিক)

ডাঃ মোঃ ইউনুস : একজন স্বপ্নময় মানুষ!

হাসান জামান

ইউনুস আঙ্কেলকে নিয়ে এখন স্মৃতিকথা লিখতে হবে কিংবা প্রিয় মানুষটা স্মৃতি হয়ে যাবেন, এ কথা কখনও ভাবিনি। অসম্ভব স্বপ্নচারী একজন মানুষ ছিলেন তিনি। অল্প দিনের পরিচয়, কিন্তু অনেক স্মৃতি। অনেক ভালোবাসতেন আমাকে, অনেক উৎসাহ দিতেন, আমার অনেক কাজের প্রশংসা করতেন। করোনা যখন প্রথম ছড়াতে শুরু করে বাংলাদেশে, তখন অনেকক্ষণ কথা হলো, তখনও তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। আমাকে বললেন 'বুঝলে জামান, অনেক কাজ বাকি। দোয়া করো যেন তাড়াতাড়ি এই মহামারি চলে যায়। আর আমি বাকি কাজগুলো শেষ করতে পারি'।

করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও কথা হয়েছে দুই-তিন বার, এ সময় তাঁকে কিছুটা বিমর্ষ মনে হয়েছে, মনে হয়েছে কিছুটা চিন্তিত। বারবার বলছিলেন, 'আমার জন্য দোয়া করো, রিতা ও ঋষিকে দেখো'--কিছুকি আঁচ করতে পেরেছিলেন? জানা হয় নাই।

মনে পড়ছে প্রথম পরিচয়ের কথা, কমিউনিটি নিয়ে কিছুকাজ করেছিলাম। উনি সেগুলির প্রশংসা করলেন, বললেন 'সবাই পারে না। কিন্তু তোমার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি আছে, এইটাকে ধরে রেখো'। এখনও কানে বাজে সেসব কথা।

যখনই আমেরিকায় আসতেন, পুরনো দিনের কথা হতো, কথা হতো দুজনেরই প্রিয় কিছুশিক্ষককে নিয়ে, আমাদের দুজনেরই প্রফেসর ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য প্রফেসর কাদেরী। আমরা দুজনেই কাদেরী স্যারের স্মৃতিচারণ করতাম। মনে আছে উনি বলেছিলেন, মেডিকেল কলেজের শেষ দিনে কাদেরী স্যার সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মেডিকেল কলেজ শেষ করে কে কী করতে চায়? আঙ্কেল বলেছিলেন আমি আমার এলাকার মানুষের সেবা করতে চাই, বিস্মিত কাদেরী স্যার বলেছিলেন ডাক্তারি পাশ করে এলাকায় থেকে এলাকাবাসীর সেবা করা অনেক মহৎ, কিন্তু কঠিন কাজ। আমি দোয়া করি তুমি কামিয়াব হও! তার দুইযুগেরও পরে ৯৬ সালে যখন কাদেরী স্যার সিরাজগঞ্জ থেকে সংসদ নির্বাচন করেন, তখন তিনি আঙ্কেলকে বলেন--'ইউনুস অনেককাল আগে তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি নিজের এলাকায় থেকে এলাকার মানুষের সেবা করতে চাও ডাক্তার হয়ে, আমি আশীর্বাদ করেছিলাম তোমাকে, কিন্তু তখনও ভাবিনি যে তুমি সকল সম্ভাবনার হাতছানিকে দূরে ঠেলে নিজের এলাকার মানুষের সেবা করে জীবন কাটিয়ে দেবে, তুমি আমার সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছ! আমি গর্বিত যে তুমি আমার ছাত্র ছিলে!' যখনই দেখা হতো, এমনই অনেক স্মৃতিচারণে

কাটত আমাদের সময়। কথা হতো মেডিকেল কলেজের নানা ঘটনা নিয়ে, উনি বলতেন ওনার স্বপ্নের কথা। কখনও ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন, এখনও কানে বাজে তাঁর সেই কথা--"বুঝলে জামান..." এভাবে তো যাওয়ার কথা ছিল না আঙ্কেল, স্বপ্নের সেই কাজগুলো তো রয়েই গেল, দোয়া করি আপনার জন্য, আল্লাহ যেন আপনাকে ভালো রাখেন ওপারে!

ওকালা, ফ্লোরিডা

আঙ্কেল ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মরণে

ইঞ্জিনিয়ার শোয়েবুর রহমান

মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মাঝে। ছোটবেলায় কথাটি অনেক শুনেছি, মা-বাবা এবং শিক্ষকদের কাছে। কিন্তু বয়সের অনেকটা পেরিয়ে এখন কিছুটা বুঝতে পারি সেটা আসলে কী। জীবনের পেরিয়ে আসা সময়টাতে বিভিন্ন সময়ে এ রকম হাতে গোনা কিছুলোকের সাথে পরিচয় হয়েছে বা তাঁদের সান্নিধ্যে এসেছি। তেমনই এক ব্যক্তিত্ব আমাদের শ্রদ্ধেয় আঙ্কেল ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। আমি যে তাঁর সাহচর্য খুব পেয়েছি, তা নয়। তবে উনি প্রতি গ্রীষ্মে ফ্লোরিডা বেড়াতে আসতেন, বিশেষ করে নববর্ষকে সামনে রেখে। প্রতি সপ্তাহান্তে যখন আমাদের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের রিহার্সল চলত, উনি আসতেন, আমাদের উৎসাহ দিতেন। রিহার্সলে উনি যেদিন উপস্থিত থাকতেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে বা এখানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্পর্কে উনাকে কিছুবলতে অনুরোধ করা হতো। উনি খুব গর্বিত বোধ করতেন, যেন পারলে পুরো বাংলাদেশকে এখানে তুলে নিয়ে আসেন। প্রায়শই উল্লেখ করতেন, ওকালা হচ্ছে আমার ছোট বাংলাদেশ। এমনই ছিল বাংলাদেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং প্রেম। যখন বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলতেন, উনি খুব উচ্ছ্বসিত থাকতেন। ওকালাবাসীদের উদ্দেশ্যে সব সময়ই বলতেন, তোমরা এখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছ, সবাই ভাইবোনের মতো মিলেমিশে থেকো। আমার পারভীন আর ঋষিকে রেখে গেলাম, তোমরা দেখো।

কখনও কখনও খাবার টেবিলে একসাথে বসতাম, কথা হতো বিস্তর। সাধারণত খাবার টেবিলে আমাদের গল্পের বিয়য়বস্তু থাকে রাজনীতি। আঙ্কেল বসলেও তার ব্যতিক্রম হতো না, তবে উনার আলোচনা হতো গঠনমূলক এবং বাংলাদেশের উন্নয়নই ছিল তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। স্থানীয় রাজনীতির সাথে তিনিও জড়িত ছিলেন, কিন্তু তার থেকেও আলোচনায় প্রাধান্য পেত ব্যক্তিগতভাবে এলাকার উন্নয়ন কীভাবে করা যায়, বিশেষ করে নিজের পেশাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে এলাকার মানুষকে সেবা দেওয়া যায়। সেখান থেকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। ভয়ংকর করোনা পরিস্থিতিও তাঁকে জনসেবা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পরিবারের অনুরোধ উপেক্ষা করে, জীবন বাজি রেখে শেষদিন পর্যন্ত জনগণের সেবা চালিয়ে গিয়েছেন, আর সে কারণেই নিজে করোনাআক্রান্ত হয়ে পড়েন, জীবন দিতে হয় তাঁকে। আমরা একদিন সবাই চলে যাব এ পৃথিবী ছেড়ে। পৃথিবীতে আসলে চলে যেতে হবে--এটাই নিয়ম। কিন্তু কিছুকিছুচলে যাওয়া সত্যিই ব্যতিক্রমী। আঙ্কেলের

চলে যাওয়া তেমনই একটি। এলাকাবাসী এখনও তাঁর জন্য আহাজারি করে। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর কর্ম বেঁচে আছে, ভাস্বর হয়ে আছে এলাকায়, তিনি বেঁচে আছেন সবার হৃদয়ে।

(নোট : নিচের লেখাটার শিরোনাম কী?)

Abdul Jabbar.
Ocala, Florida, USA

ফ্লোরিডা স্টেটের ওকালা শহরে আমার বসবাস এক যুগের অধিক। এই শহরে বাংলাদেশি ১৭-১৮টি পরিবার বাস করে। আমরা এক সাথে মিলিত হয়ে ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করি। প্রতি বছর বাংলাদেশি জনপ্রিয় গায়কদের আমন্ত্রণ করে সাড়ম্বরে বৈশাখী মিলন মেলা উদযাপন করি। খান সাহেব বিগত ৮ বছর যাবত নিয়মিত আমেরিকা বেড়াতে আসতেন। তাঁর তিন মেয়ে আমেরিকা ও কানাডায় বসবাসরত। পরিবারের নাতি, পুতি, মেয়ে, জামাই, ভাই-ভাবি এ সময়টা আনন্দে কাটাতেন। আমিও সে ভাগ পেতাম। তাঁর বড় মেয়ে রিতা আমার প্রতিবেশী। এই সুবাদে গোটা পরিবারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। এক সময়ে জানতে পারি তাঁর বড় ভাই ও আমি একই নামে পরিচিত। অন্যদিকে আমার মরহুম বড় ভাই ও খান সাহেব একই নামে পরিচিত। সেদিন থেকে আমরা একে অপরের ভাই ছিলাম। ভাগ্যের পরিহাস সহোদর বড় ভাইকে হারিয়েছি ৩ যুগ আগে, আর বন্ধুবড় ভাইকে হারালাম বার্ধক্যে।

খান সাহেব ওকালায় অবস্থানকালে আমাদের দুজনের যুগল আড্ডায় দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষা ও কর্মজীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ ইত্যাদি। তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করে, নিজের পল্লি এলাকায় আপামর জনগনের চিকিৎসাসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সন্তানরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আমেরিকা, কানাডায় বসবাস করছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে কন্যা, নাতি-নাতনীদের সাথে অবসর জীবন যাপন এবং দেশ-বিদেশ ঘুরে কাটানোর পরামর্শ দিলে, তিনি কোনোদিন এ কথায় সায় দেননি। বলতেন, 'যে মাটিতে জন্মেছি সেই পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কোলে মাথা রেখে বাংলার বুকে শেষ নিঃশ্বাস নিতে চাই। তাঁর সেই আশা পূরণ হয়েছে। অভাবগ্রস্ত রোগীদের কাছ থেকে

ফি নিতেন না। তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে ফি দিতেন, তিনি তাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছেন। তিনি অত্র এলাকায় 'গরিবের ডাক্তার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি স্থানীয় কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। জানা যায় ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে রিকশায় ওঠার সময়, কমিটির সম্পাদক তাঁকে একটি খাম দিয়ে বলেন, 'রেখে দেন, পরে দেখবেন।' রিকশা ছেড়ে দিলে, ডাক্তার সাহেব খামটা খুলে দেখেন খামটিতে টাকা রয়েছে। তৎক্ষনাৎ তিনি কলেজে ফিরে টাকাসহ খামটি কমিটির সম্পাদককে ফেরত দেন।

গরিবের বন্ধুছিলেন, ছিলেন একজন সৎ চরিত্রের অমায়িক ব্যবহারের মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে খান সাহেবের অবদান ছিল বহুমুখী। নিরীহ হিন্দুদের সুরক্ষা দিয়েছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের কৌশল দিয়ে প্রতিরোধ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শ, অর্থ ও ছায়া দিয়ে সহায়তা করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে মুক্তিযাদ্ধা সনদ প্রদান করলে, তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ দেশের অনেক রাজাকার এবং অমুক্তিযোদ্ধা সনদ বানিয়ে নকল মুক্তযোদ্ধা সেজে দেশকে কলঙ্কিত করেছে। ২০১৯ সালে

দেশে ফেরার পথে আমার বাড়ির সামনে রিতা গাড়ি থামালে, জানালা দিয়ে আমি হাত বাড়ালেই আমার দ্বিতীয় বড় ভাই হাত চেপে ধরে বললেন, 'আর দেখা হবে কি না জানি না। দোয়া করবেন।' আমি বললাম, 'এ কথা মুখে আনবেন না। আপনি শত বছর বেঁচে থাকুন।' রিতাও আমার সাথে সাথে বলল, 'আপনি এ কথা আর কখনও মুখে আনবেন না।' রিতার তোলা ছবিটা প্রায়ই দেখি আর স্মৃতিচারণে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। সন্ধ্যা আকাশের উজ্জ্বল শুকতারা হয়ে চিরদিন স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়-পরিজন ও রোগীদের মনে জ্বল জ্বল করুন।

স্মৃতির গহীনে

মো. মাহমুদুন্নবী সেলিম

জীবনে চলার পথে কার সাথে, কখন কীভাবে দেখা হবে মানুষ তা জানে না। আবার কার সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা গড়ে উঠবে, তা পূর্ব অনুমেয় নয়। জীবন নামক বহতা নদীর বাঁকে বাঁকে স্মৃতির সাম্পান কখন, কোথায় ভিড়ে কিছুমানবদরদি মানুষের সংস্পর্শ লাভ করবে, তাও বলা মুশকিল। প্রকৃত অর্থে সমাজের কিছু মানুষ ব্যক্তিত্বে, আভিজাত্যে, রুচি-বৈচিত্র্যে অতি সহজেই চুম্বকের মতো মানুষকে কাছে টেনে নেয়, অতি সহজে হয়ে ওঠে আত্মার আত্মীয়। তেমনি একজন মানুষ আমাদের সবার প্রিয় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান চাচা।

চাচা বললাম এই কারণে যে, উনি আমার বান্ধবী ইসমত আরা পারভীন রিতার বাবা। রিতা আমার ক্লাসমেট ছিল। শাহজাদপুর সরকারি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় রিতার সাথে আমার পরিচয়। ওঁর বাবা শাহজাদপুর সদর উপজেলার বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চারদিকে অনেক সুনাম তাঁর। শুধু অর্থবিত্তে নয়, হাত যশে, উদারতায়, মূল্যবোধে ও আদর্শিক আধুনিক মানসিকতায়। একজন স্বার্থক বাবা হিসেবে তিনি তাঁর তিন কন্যা সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা, মেধা-মনন ও ভাবনা-চিন্তায় গড়ে তুলেছেন অতুলনীয় স্নেহ-মমতা দিয়ে। তিন মেয়ের দুইজন আমেরিকা ও একজন কানাডা প্রবাসী। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমার বান্ধবী রিতা আমেরিকার ফ্লোরিডায় একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার।

যে প্রাসঙ্গিক কারণে আমি চাচাকে মনের মুকুরে ধরে রেখেছি সেই বর্ণনায় আসি। শিক্ষাজীবনে ইন্টারমিডিয়েটে পড়া বন্ধুরাই সবচেয়ে বেশি হারিয়ে যায়। মাত্র দুই বছরের শিক্ষাজীবন চোখের নিমিষে ফুরায়। এর মধ্যে পরিচয় হতেই এক বছর; আর পরীক্ষার ঘোরে কাটে দ্বিতীয় বছর। যদিও ঘোরে কাটা দ্বিতীয় বছরটি আমার কেটেছে অন্য কলেজে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তায় বুঁদ থাকা এই স্বল্প সময়ে ভালোভাবে পরিচয়ই ঘটে না সবার সাথে। রিতার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতয় ঘটেনি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর কৃষিবিদ হতে আমি চলে যাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে আর রিতা ডাক্তারি পড়তে পাড়ি জমায় বিদেশে। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একই ঘটনা ঘটে আরো অনেক বন্ধুর সাথেও। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার পর আমি আমেরিকার ডাইভার্সিফিকেশন ভিসা লটারি পাই। বহু বছর পর জানতে পারি রিতাও বিদেশ থেকে ডাক্তারি পড়াশোনা সম্পন্ন করে আমেরিকায় ভিসা নিয়ে যাচ্ছে। আমি ওঁদের বাসায়

যাই খবরাখবর জানার জন্য। আর এই সময়ই দেখা হয় রিতার মহিমান্বিত বাবা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান চাচার সাথে। খুব অল্প সময়ের দেখা। উনি আমার সাথে মিষ্টি করে কথা বললেন। নিজ হাতে আপ্যায়ন করলেন। জাদুকরী ব্যক্তিত্বে নিমিষেই আমাকে মুগ্ধতায় আবিষ্ট করলেন। আমি বিস্ময়ে পাহাড় সমান এই মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলাম আর তখন থেকেই মনের অজান্তে আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার একটি পারিজাত পুষ্প পল্লবে দল মেলে আস্তে আস্তে তাঁর জন্য ফুটতে শুরু করল। বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান চাচা আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু সেই এক পলকের একটু দেখার স্মৃতিটুকু স্মৃতির গহীণে শুকতারার মতো আজও জ্বলজ্বল করছে।

ইস্টমেডো, নিউইয়র্ক।

ডা. মো. ইউনুস আলী খান : 'পিপল্‌স ডক্টর'

রুমি আহমেদ খান

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট করে নগরমুখো হননি, ফিরে গেছেন মাটি ও মানুষের টানে নিজের শেকড়ের দিকে! শাহজাদপুরে গড়ে তুলেছেন ক্লিনিক, নিরলসভাবে চিকিৎসা দিয়ে গেছেন আবালবৃদ্ধবনিতা--দরিদ্র, সহায় সম্বলহীন সবাই চিকিৎসা পেয়েছেন!

জীবনের প্রতিটি কর্মময় বছর ব্যয় করেছেন নিজের শেকড় শাহজাদপুরে! জীবনের শেষ কর্মক্ষম দিন পর্যন্ত দরিদ্র ও দুস্থকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়েছেন। ওনার সুযোগ ছিল বড় শহরে চলে যাওয়ার অথবা দেশ ছেড়ে আমেরিকা, কানাডা অভিবাসী হতে পারতেন পার্মানেন্টলি। কিন্তু শাহজাদপুরের মানুষের জন্য প্রাণ কেঁদেছে তাঁর, ছেড়ে যেতে পারেননি! কোভিড মহামারিতে দেশের সব ডাক্তারের চেম্বার, ক্লিনিক বন্ধ। ডাক্তাররা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে চেম্বার বন্ধ রেখেছেন। বয়স বিবেচনায় ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সাহেব ইনফেকশনের হাই রিস্কে আছেন। ওনার পরিবারের পক্ষ থেকেও ওনার ওপর কড়া নজরদারি, ওনাকে সবাই উপদেশ দিচ্ছেন রোগী না দেখে বাড়ির মধ্যে লকডাউনে থাকতে। কিন্তু দরিদ্র দুস্থ মানুষ রোগ-জ্বরা নিয়ে সাহায্যের জন্য আসে, উনি না বলেন কীভাবে? গোপনে গোপনে বিনামূল্যের চিকিৎসা চালিয়ে যান। এভাবেই কোনো একদিন মরণঘাতি কোভিড বাসা বাঁধে ডাক্তার সাহেবের শরীরে! দীর্ঘ লড়াই শেষে কোভিডের সাড়ে ৮ লক্ষ ভিকটিমের একজন হয়ে যান!

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সাহেব সত্যিকারের গণমানুষের চিকিৎসক বলতে যা বোঝায়, তাই ছিলেন। এ পিপল্‌স ডক্টর। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সাহেব ছিলেন একটিভিস্ট ডাক্তার। উনি রাজনীতিকে এভোয়েড করেননি, বরং রাজনীতিকে এমব্রেস করেছিলেন বুক চিতিয়ে। উনি কিন্তু রাজনীতি থেকে সুবিধা নেননি, বরং তাঁর মতো মানুষের অংশগ্রহণের ফলে রাজনীতির মাঠ এনরিচ হয়েছে। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একজন সফল মানুষ এবং সফল চিকিৎসকের প্রতিকৃৎ। উনি একজন সফল পিতা, মেয়েদের গড়ে পিটে মানুষ করেছেন, শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে! ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম নাগরিকদের একজন! আমার কুর্নিশ শ্রদ্ধা আকাশ সমান উঁচুএই মানুষটির প্রতি!

আমার দাদা

সারফুল আলম খান টুটুল

দাদার কথা মনে পড়লেই আমার যেসব স্মৃতি মনের মধ্যে নাড়া দেয়। আমার দেখা ভালো মানুষদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ছিলেন বিনয়ী আন্তরিক ও সুশৃঙ্খল একজন মানুষ। আমি ছোটবেলা থেকে তাঁকে দেখে আসছি একই নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে। দাদা যখন আমাদের পাবনার বাড়িতে আসতেন, তখন আমাদের দেখা হতো কথা হতো। তাঁর সাথে যতটুকু মিশতে পেরেছি তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমি, জনি আর তানজির একবার শাহজাদপুরে গিয়েছিলাম মোটরসাইকেল নিয়ে। এর আগেও অনেকবার গিয়েছি আমাদের বাড়ির সদস্যের সাথে। আমরা দাদার চেম্বারে গিয়ে দেখলাম তিনি খুবই ব্যস্ত, আমাদের তাঁর বসার রুমে বসতে দিলেন। অনেক সময় পরে রোগী দেখার ফাঁকে দুপুরের খাবারের সময় দেখা করতে আসলেন। এসেই আমাদের সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির সবাই কেমন আছেন খবর নিলেন। আমার কিছুডাক্তারি পরীক্ষা করার দরকার ছিল। ওখানকার লোকদের বললেন তাড়াতাড়ি করিয়ে দিতে। তিনি যখন পাবনার বাড়িতে আসতেন তখন পরিচিত, অপরিচিত অনেক লোক সকাল থেকেই আসতে শুরু করতেন।

তাঁর আসার খবর পেলে এখানেও রোগী ভিড় করত। দাদা বেড়াতে এসেও রোগী দেখতে হতো, এর জন্যে তিনি কখনও রাগ করতেন না কিংবা বিরক্ত হতেন না। রোগী দেখার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সবাইকে সময় দিতেন। সবার খোঁজ নিতেন, কে কী করছে, কার কী সমস্যা সব নিয়ে আলোচনা করতেন। আবার এমনও হতো দাদা চলে যাবে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তখন রোগী এসে হাজির। তখনও তিনি রাগ করে রোগী না দেখে চলে যেতেন না। যাওয়ার সময় আমাদের সবাইকে ডাকতেন, সবার সাথে দেখা করে গাড়িতে উঠতেন। আবার কাউকে না দেখলে জিজ্ঞেস করতেন, ও কোথায় ওর সাথে তো দেখা হলো না। সবাইকে ভালো ভালো উপদেশ দিয়ে যেতেন। বাচ্চাদের সাথে গল্প করা তাদের সময় দেওয়া তাঁর ছিল খুবই প্রিয়। আমার এখনও মনে পড়ে দাদা চলে যাবে তখন আমাদের বাড়ির বাইরে অনুপ আর উপমা ব্যাডমিন্টন খেলছিল, দাদা সেখানে এসে হাজির। অনুপদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলে তার পরে শাহজাদপুরে রওয়ানা হলেন।

দাদার আন্তরিকতার আর একটা উদাহরণ হলো, আমার বিয়ের রেজিস্ট্রি করার সময় দাদাকে কাকা ফোন দিয়ে সব খুলে বলে, তিনি নিজেই দিন ঠিক করে দেন। আমরা ভাবছিলাম দাদা যে ব্যস্ত মানুষ তাতে হয়তো শেষ পর্যন্ত আসতে পারবেন

না, অথবা আসলেও খুব কম সময়ের জন্য আসবেন। কিন্তু আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে দাদা সকালেই উপস্থিত হলেন। এসেই সবার খোঁজ খবর নিলেন, কতদূর কী হয়েছে প্রস্তুতি কেমন সব কিছু। সব প্রস্তুতি শেষ করে আমরা মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। দাদা আমাদের সবাইকে গাড়িতে উঠতে বললেন। আর আমাকে তার নিজের গাড়িতে উঠতে বললেন। আমরা যখন কনের বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন ওদের বাড়ির সবাই খুবই খুশি হয়েছিল। কারণ তাঁরাও ভাবতে পারেনি যে দাদা উপস্থিত থাকতে পারবেন। দাদা নিজে উপস্থিত থেকে আমার বিয়ের সব কাজ সম্পূর্ণ করেন। যেটা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এর পরে যখন বিয়ের অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তখনও কাকা ফোন করে বিস্তারিত জানায়। দাদা খুবই খুশি হয়ে নিজেই একটা দিন ঠিক করে দেন। তখন রিতা ফুপু আমেরিকা থেকে দেশে আসছিল, আর আমাদের ফুপাত ভাই রিশিত গ্রামের বাড়ি দেখার জন্য খুবই আগ্রহী ছিল। আমেরিকা জন্ম ও বসবাসের কারণে তার নানুর বাড়ি দেখার সুযোগ হয়নি। দাদাও তার শিকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দাদা হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন--দেখো, এইখানে আমি জন্মেছিলাম, এখানে আমার বাড়ি, এটাই আমার শিকড়। দাদা আশায় আমরা সবাই মিলে সেদিন অনেক আনন্দ করেছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত দাদা বসে বসে আমাদের আনন্দ উপভোগ করেন। দাদা শাহজাদপুরে ফিরে যাওয়ার দিন আমাদের দুই ভাই আর বউদের তাঁর ঘরে ডাকলেন। নতুন সংসারে কীভাবে মিলেমিশে চলতে হবে, সে বিষয়ে কিছুগুরুত্বপর্ণ উপদেশ দিলেন।

এর পরে দাদার সাথে অনেক দিন দেখা হয়নি। দাদা আর দাদি এর মধ্যে অনেকবার ঢাকায় এসেছেন, তাদের ডাক্তারি চেকআপের জন্য আমাদের হাসপাতালে। দাদা যখনই আসতেন দুলাল কাকা ফোন করতেন, তোর দাদা আসছে সাথে থাকিস। একবার আসছিল দাদা না কি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, তার জন্যে কিছু ডাক্তারি চেকআপ করাতে। তখন অনেক কথা হয়েছিল। আমার ছেলেটার ছবি দেখালাম। কারণ ওর জন্মের পরে দাদা ওকে দেখেননি। দাদা ভালো করে ছবিটা দেখলেন, তারপর দাদিকে বললেন, দেখেছ ওর চোখটা একদম রিতার ছোটবেলার মতো। এর মধ্যে ডাক্তার ডাকলেন, আমরা রুমে ঢুকলাম। ডাক্তার বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, 'আপনি কি ধূমপান করেন?' দাদা বললেন, 'আগে করতাম, আমার ছোট মেয়ের কথায় ধূমপান ছেড়েছি। আর নাতি (রিশিত) একদিন বলে তুমি আর পান খাবে না, আমাকে কথা দাও, আমিও কথা দিয়ে ফেললাম। এরপরে আর পান খাইনি।'

রিপোর্ট দিতে দেরি হচ্ছিল তাই আমরা নিচে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আরও অনেক কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে মুজিববর্ষের প্রস্তুতি চলছিল, দুলাল কাকা একটা ব্যাজ এনে বাবুকে বললেন, 'এটা তোমার নানুকে পরিয়ে দাও।' বাবু বলল, 'নানু এটা তোমাকে লাগিয়ে দিই।' দাদা বললেন, 'না, আমি যখন আওয়ামী লীগ করছি তখন দলের খারাপ সময় ছিল। এখন দল ভালো সময় পার করছে, তাই এটা লাগিয়ে আমি

দেখাতে চাই না যে আমি আওয়ামী লীগ করি। তুমি হয়তো জানো না যে আমি কিছুদিন আগে চিকিৎসাসেবার ওপর একটা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি।' আমরা তখন বললাম, 'তাহলে তো সেটা উদযাপন করা দরকার।' দাদা সেটাতেও মানা করলেন। তখনই বুঝতে পারলাম, আসলে দাদা প্রচারে বিশ্বাসী না, কর্ম দ্বারা এগিয়ে যাওয়া এবং ভালো কাজ করে সবার মাঝে বেঁচে থাকাই তাঁর ইচ্ছা।

সর্বশেষ দাদা যখন হাসপাতালে ভর্তি হয় তখন করোনা রেড-অ্যালার্ট চলছে, করোনার ভয়ে সবাই ঘরে বন্দী। দাদাকে হাসপাতালে আনার পরে প্রথমে এইচডিইউতে ভর্তি করা হয়, পরে আইসিইউতে নেওয়া হয়। করোনা হাসপাতাল হওয়ার কারণে ভেতরে কাউকে যেতে দিত না। এমনকি ডাক্তার, নার্স, পিসিএ কাউকেই রোগীর কোনো খবর দেওয়া নিষেধ ছিল। আমি এখানে চাকরি করি, আর দুলাল কাকা এখানকার মালিক হওয়ার কারণে আমি সব খবর নিতে পারতাম। দাদার সাথে এর মধ্যে ভিডিও কলে কথাও বলেছিলাম, আর ফোনেও দুই-এক দিন কথা বলেছিলাম, দাদির সাথেও কথা বলিয়ে দিয়েছিলাম। প্রতিদিন অনেকেই আমাকে ফোন করত, দাদা কেমন আছে জানার জন্যে। তাই কমপক্ষে দুইবার করে খবর নিতাম, টেলিফোন করতাম ডিউটিরত ব্যক্তিদের কাছে। বিদেশে থেকে ফুপুরা বিভিন্ন সময় অনেক কথা বলতে বলতেন সেগুলো আবার দাদার কাছে বলতাম।

শেষের দিনগুলোর অনেক স্মৃতি আমাকে এখনও ব্যথিত করে। সেসব ভাবলে এখনও বুকের মাঝে একটা শূন্যতা অনুভব করি। দাদা এমন একজন মানুষ ছিল যে আমাদের সবার মাঝে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করে রেখেছিল। এখন আর সেই মুখে শুনতে পাব না তোরা কেমন আছিস, বাড়ির সবাই কেমন আছে, এখন কী করছিস। আত্মীয় তো অনেক থাকে, কিন্তু সবার খবর রাখার মতো আত্মীয় সবাই হতে পারে না।

(এই লেখাটি যাবে?)

Dr. Yunus Ali Khan was a humble, soft-spoken man. We had the pleasure of knowing him starting at a celebration of his grandsons's birthday. We are saddened by the news Dr. Khan's untimely passing. He will be missed, but his kind spirit will remain in our memories.

Shanti

Ocala, Florida.

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

ফারহানা জিনিয়া

নভেম্বর মাসটি ফ্লোরিডাতে বেশ ঠান্ডা আবহাওয়া থাকে। আমি জিনিয়া, গত ২০ বছর থেকে বসবাস করছি ফ্লোরিডাতে। আমেরিকার এই স্টেটটির আবহাওয়া আমাদের বাংলাদেশের মতো আর সে জন্যই আমরা এখানে বসবাস করছি। নভেম্বর মাসের ২ তারিখ শুরু হলো রাত ১২ টায়, ১২টা ১ মিনিটে বেজে উঠল আমাদের রিং বেল। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছি যে আমাদের বন্ধুরা আজ আসবে, কেননা আজ আসিফের জন্মদিন। দরজা খুলে দিলো বাচ্চারা, আমাদের প্রিয় সব মুখগুলো দরজা ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে আর তাঁদের সাথে আছেন আমাদের অতি প্রিয়, শ্রদ্ধেয় ইউনুস আঙ্কেল ও আন্টি। সব্বাই হই হই করে ঘরে ঢুকল। আমরা ওদের সাথে নিয়ে আসা কেক কাটলাম, ছবি তুললাম, ডিনার খেলাম। পুরো বাড়িতে আমাদের হলো আনন্দের উৎসব। সবই চলে যাওয়ার পর আসিফ আমায় বলল, 'লজ্জা হচ্ছিল যে, এই বয়সে জন্মদিন উদযাপন করতে'। আমি ওকে বললাম, 'তোমার এই জন্মদিনটা খুব স্পেশাল। আগামী বছর আমরা কে কোথায় থাকব, হয়তো কেউ থাকবে, কেউ থাকবে না।' তখন কি জানতে পেরেছি যে কথাটা কতটা সত্যি হয়ে যাবে বছর না ঘুরতেই ! মানুষ মানুষের জন্য কত মানুষ মেনে চলে আজকের দুনিয়ায় এই বাক্যটি?

বাস্তব এই আজকের দুনিয়াতে আমরা সকলেই কমবেশি স্বার্থপর হয়ে গেছি, ভুলতে বসেছি ভূপেন হাজারিকার গাওয়া সেই বিখ্যাত গানটি ...ছন্দটি। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আঙ্কেল আমাদের ওই লাইন দুটি মনে করিয়ে দিলেন। মানবকল্যাণে দিয়ে গেলেন তাঁর অমূল্য জীবন। ধন্যবাদ আঙ্কেল।

ডাক্তার আঙ্কেল তার নিজের শহরে বিপুল জনপ্রিয় একজন চিকিৎসক, এ কথা দেরিতে হলেও এখন আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমি আঙ্কেলকে চিনি একজন সদাহাসিমুখ, সৌখিন, সদালাপী মানুষ হিসেবে। আঙ্কেল প্রতি বছর একবার হলেও আমাদের ওকালাতে বেড়াতে আসতেন, দেখে যেতেন তাঁর অতি আদরের বড় মেয়ে রিতা ও তাঁর নাতি রিশিতকে। আমাদের সবার মাঝে চলত তখন এক আনন্দের বন্যা। এত নামী একজন মানুষ কিন্তু কী সহজ-সরল তাঁর চলাফেরা, নেই কোনো রাগ কোনো অভিযোগ। যখন কোনো বাচ্চার সাথে আলাপ করতেন, নিজেও যেন বাচ্চাদের নানাভাই হয়ে যেতেন, বড়দের সাথে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং নিজ বয়সিদের সাথে পুরনো বন্ধুর মতো আচরণ ছিল তাঁর। এমন কোনো বিষয় নেই যার ব্যাপারে তার জ্ঞান নেই। যতবার যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, আঙ্কেলকে পেয়েছি সেই

বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ মানুষ হিসেবে। আঙ্কেল আমাদের সন্তানদের বাংলাদেশ এবং মাতৃভাষার চর্চার উপদেশ দিয়েছেন সব সময়। তাঁর নাতিদের উপহার দিয়েছেন বাংলা বর্ষবরণের পাঞ্জাবি। খুব পছন্দ করতেন নিজের ফোনে ছবি তুলতে আর বারবার সেই ছবি দেখতে। অনেক ছবি তুলেছি আমরা একসাথে। কত জায়গাতে গিয়েছি আমরা এখন সে সবই আমাদের জন্য অমূল্য স্মৃতি!

আঙ্কেল আদর করে আমাকে পাগলি মা বলতেন, খুব পছন্দ করতেন আমার হাতের ঘন ডাল দিয়ে পালং শাক রান্না। গত সপ্তাহে রান্না করতে গিয়ে বারবার চোখ ভিজে গেছে আমার! হাজারো মানুষ কাঁদিয়ে চলে গেলেন উনি। সারাজীবন উনি সকলকে দিয়ে গেছেন আর চলে গেলেন কারও কাছ থেকে কিছুই না নিয়ে।
ওপারে ভালো থাকবেন আঙ্কেল।
Near of far, I wish you were here...

২৯ আগস্ট, ২০২০
ওকালা, ফ্লোরিডা

আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব

রোমানা ইয়াসমিন

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান--এটা শুধু একটি সাধারণ নামই নয়, যখন এই নামটি শুনি তখন শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে যায়। উনি ছিলেন আমার দেখা অসাধারণ একজন মানুষ। একজন খুব ভালো ডাক্তার। উনি যে শহরটিতে বসবাস করতেন সেখানে সবাই ওনাকে 'গরিবের ডাক্তার' নামেই চিনতেন। উনি সারা জীবন সাধারণ মানুষের সেবায় কাটিয়েছেন। এমন একজন অসাধারণ মানুষকে আমার কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ফ্লোরিডার ছোট্ট একটি শহর ওকালাতে আমার বসবাস। সেখানে আরো একজন জনদরদি ডাক্তার থাকেন ডাঃ ইসমত পারভীন। দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক, তা ব্যখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানই ডাঃ ইসমত পারভীনের গর্বিত বাবা। পারভীন আপার মাধ্যমেই চাচার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। চাচার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই উনি দিয়েছেন আমাদের অঢেল ভালোবাসা। নিজের মেয়ের মতোই আমাদের অনেক আদর করতেন।

আমার হাসবেন্ড মানুষ হিসেবে খুবই চুপচাপ প্রকৃতির, কিন্তু যখনই চাচাকে আমার হাসবেন্ডের সঙ্গে দেখতাম, আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। দুজনের গল্প চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর আমি অবাক হয়ে যেতাম এত কী গল্প করে! আমি তো ওকে এত গল্প করতে কখনও দেখিনি। আসলে ইউনুস চাচা ছিলেন একজন খুব ভালো বক্তা ও শ্রোতা। চাচা যখনই কোন কথা বলতেন, তখনই আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কখনই বিরক্ত লাগত না, প্রতিটি কথাই মন ছুঁয়ে যেত। উনি আমাদের এই ছোট্ট বাংলাদেশি কমিউনিটিকে খুব ভালোবাসতেন। সবসময় বলতেন, এটা ওনার দেখা সেরা বাংলাদেশি কমিউনিটি। আমার হাসবেন্ড মাঝেমধ্যে একটু গান করে থাকেন। ইউনুস চাচা ওর গাওয়া গানগুলো খুব পছন্দ করতেন।

২০১৯ সালের কথা। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল চাচাকে নিয়ে একটুবেড়াতে যাওয়ার। প্রথমে আমরা pumpkin patch যাই, তারপর carnival-এ। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, ওনার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা ছোট্ট শিশু। আমার মেয়ে ফিওনা র সাথে চাচাও যেন একটা ছোট্ট শিশু হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন pumpkin patch Avi carnival-এ যে কী পরিমাণ আনন্দ করছিলেন, আমরা তা অবাক হয়ে দেখেছিলাম। 'পিয়ানো' শব্দটি শুনলে মনে হয় একটি বাদ্যযন্ত্রের কথা বলছি। কিন্তু না, এই নামটা চাচা আমার মেয়েকে দিয়েছিলেন। তিনি আমার মেয়েকে

'পিয়ানো' বলে ডাকতেন। হেসে বলতেন, ও সবসময় পিয়ানোর মতো বাজতেই থাকে। মনে হতেই খুব ভালো লাগে যে, ইউনুস চাচা ফিওনা কে খুব আদর করতেন আর অনেক ভালোবাসতেন। আজ চাচা নেই, কিন্তু তাঁর দেয়া নাম আর ভালোবাসা এখনও জীবন্ত আছে, যা আমাদের স্মৃতিতে থাকবে সারাজীবন।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আমাদের চাচা, যিনি তাঁর কর্মের দ্বারা এবং তাঁর গুণের কারণে সারাজীবন আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন ওনাকে পরকালে সবচেয়ে ভালো স্থানটি প্রদান করেন, আমরা তাই দোয়া করি। উনি ইহকালের মতো পরকালেও যেন ভালো থাকেন, আমিন।

(ফ্লোরিডা, আমেরিকা)

ডা. ইউনুস আলী খান আঙ্কেল আমাদের পরিবারের সদস্য

শামীমা খাতুন

আঙ্কেল আমাদের মাঝে ছিলেন ফ্যামিলির একজন সদস্যের মতো। উনি আমাদের খুবই আদর করতেন, ভালোবাসতেন, গল্প করতেন, ভালো ভালো উপদেশ দিতেন--ঠিক যেন বাবার মতো। একটা ব্যাপার আমি খুব বেশি মিস করি সেটা হচ্ছে, তিনি সবসময় হাসিমুখে কথা বলতেন। আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবতী মনে করি উনার সান্নিধ্য পেয়ে। তাঁর প্রত্যেকটা কথা ও কাজে আমি অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি, অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করছি। উনি এতবড় একজন ডাক্তার হলেও, তাঁর মধ্যে কখনও অহংকার দেখিনি। আমার বাসায় দাওয়াত দিলে খুব খুশি হতেন এবং বলতেন, মনে হচ্ছে যেন দেশে নিজের বাসায় বসে খাচ্ছি। আর অনেক প্রশংসাও করতেন। এই কথাগুলো অনেক মিস করি। আরও অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। এত ক্ষুদ্র পরিসরে তা লেখা সম্ভব না। আল্লাহ্; সুবহানাহুতায়ালা উনাকে যেন বেহেস্ত নসীব করেন। আমিন।

Ocala Fl- U.S.A.

এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

রাবেয়া (নোট : পুরো নাম কী?)

সমুদ্রের পানি যেমন শেষ হওয়ার নয়, তেমনি ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের মহানুভবতাও অসীম। সেটা তাঁর জীবদ্দশায় প্রস্ফুটিত। সৌভাগ্যক্রমেই আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম। তিনি আমার বড় চাচা। হঠাৎ করোনার উত্তাল তরঙ্গে একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত থেকেই অনেককেই জিতিয়ে দিয়ে নিজেই হারিয়ে গেলেন না ফেরার দেশে। মুহূর্তেই স্তব্ধতায় আবদ্ধ হয়ে গেল আমাদের চার পাশ। শুধুমনের একান্ত চাওয়া ছিল পরিবেশ ফিরে আসুক আমাদের অনুকূলে। কাকা না ফেরার দেশে চলে যাবেন, তাঁকে নিয়ে লিখতে হবে ভাবনার জগতে জানা ছিল না। যতবার লিখতে বসেছি, ততবারই পানিতে দুই চোখ ভরে গেছে, কিন্তু লিখতে পারিনি। আবার বসেছি। হয়তো অনেক কিছুনা লেখাই থেকে যাবে। তবুও লিখতে হবে এটাই হয়তো প্রকৃতির চাওয়া। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার বিশাল সাগরে অনেক ভালোবাসা কাকার জন্য। তাঁর উদার বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচনা করেছেন এক আলাদা পৃথিবী। সে পৃথিবীতে ছোট-বড়, কাছের দূরের প্রত্যেকেই আবিষ্কার করেছেন নিজেকে। ছোটবেলা থেকে কাকাকে দেখেছি মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাতে। তাঁকে ঘিরে অনেক স্মৃতির মাঝে মনে পড়ে ছোটবেলায় বাসায় গেলে, দশ টাকার একটা নোট হাতে দিতেন। আর বলতেন বৃত্তি পেলে একটা ঘড়ি কিনে দেব। এখনও কানে বাজে সে কথা। শিক্ষাজীবনে শাহজাদপুর পাঁচ বছর অতিবাহিত করার সুবাদে দেখেছি, সেখানকার মানুষ কাকাকে কত আপন মনে করে ভালোবেসেছে। এটা অবশ্যই একজন মানুষের জন্য বিরল পাওয়া। তাঁর অমায়িক হৃদ্যতা, সহানুভূতি, দুর্লভ কর্মনিষ্ঠা অনন্য ব্যক্তিত্ব আকাশের মতো বিশাল উদারতা ও সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে সহযোগী মনোভাব তাঁর বৈশিষ্ট্যকে করে তুলেছে স্বকীয়।

কাকা ছিলেন এক অনন্ত জ্ঞানের আলোর জগৎ। আমরা সবাই সেই জগতের অভিসারী। আমার আব্বাকে দেখতাম, যেকোনো সমস্যা দেখা দিলে বা অসুস্থ হলে কাকার পরামর্শ ছাড়া শান্তি পেতেন না। আমাদেরও মনে হতো, কাকা বিশাল এক ভরসার জায়গা। আজ কাকা নেই, কাকার আদর্শ আমাদের সবার মাঝে আছে।

কাকা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে কাকা মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, খাবারসহ যাবতীয় সুবিধা দিয়েছেন। নিজেকে ও পরিবারকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং এর সাথে যুক্ত ছিলেন আমার আব্বা লুৎফর

রহমান খান (তাঁর ছোট ভাই)। তাঁর বৃহৎ জীবনের বিশাল অংশজুড়ে ছিল জনসেবা। একদিকে পরিবার, অন্য দিকে দেশের মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন কমিটেড।

শেষবার কাকার সাথে কথা হয় মুঠোফোনে। তিনি তখন আমেরিকা আপা অর্থাৎ তাঁর বড় মেয়ের বাসায় ছিলেন। আমার মেয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে জেনে সে কী এক আত্মতৃপ্তির ঢেকুর দিয়ে কথোপকথন চালালেন আমার সাথে। সেদিন মনে হয়েছিল, আব্বা যেন আমার সাথে কথা বলছেন। তাঁর শেষ কথা ছিল—"ছন্দা মানুষ পৃথিবীতে কী রেখে যায় জানো?" আমি কাকার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছি। কাকা বললেন—"সুসন্তান। সন্তানকে এমনভাবে মানুষ করবা যেন পরিবারের সহায়ক হয় দেশের গর্ব হয়।" কাকা ঠিক তেমনটাই করেছেন তাঁর জীবনে। কাকার এই কথাটা আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে লেখা শেষ হওয়া আসলেই মুশকিল ও কষ্টকর। তবুও তাঁর মূল্যবান জীবন সম্পর্কে খুব স্বল্প পরিসরে লেখা শেষ করলাম। পরিশেষে কাকার আত্মার মাগফেরাত ও আমার চাচির নেক-হায়াত এবং তাঁর পরিবারের উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। তাঁকে হারানোর মতো এত বড় কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দান করুক সৃষ্টিকর্তা। এটাই প্রত্যাশা।

অসাধারণ একজন মানুষ

কাজী আরিফ মাহমুদুল আলম

হাজারও ব্যস্ততার মাঝেও আমরা কাউকে না কাউকে বেশি মনে করি, কারও প্রতি শ্রদ্ধার একটি আসন তৈরি থাকে সব সময়। এমনই এক আসনের মালিক আমার ফুফা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। যতদূর পর্যন্ত স্মৃতি আওড়াতে পারি, তাতে ওনাকে খুব ভালো মানুষ হিসেবেই পাশে পেয়েছি।

পেশায় ডাক্তার ছিলেন। তিনি খুব সহজেই মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে। নিজ গ্রাম তো বটেই আশপাশের গ্রামের লোকজনও তাঁকে এক নামে চেনে। বহু দূর-দূরান্ত থেকেও লোকজন আসত তাঁর চিকিৎসা নিতে। যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে ছুটে যেতেন রোগীর কাছে। সবার কাছেই তিনি ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। আজ সেই মানুষটি আমাদের মাঝে নেই--এই কথাটা মানতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এত বছর ধরে যে মানুষটা শত-সহস্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেণ, তাঁদের সুস্থতার দায়িত্ব নিয়েছেন, আজ সেই মানুষটাকে হারিয়ে সবাই যেন বটবৃক্ষের ছায়াটা হারিয়েছে। বিষণ্নতায় ছেয়ে গেছে চারপাশ। কী যেন এক অজানা চিন্তা ফুটে উঠেছে সবার চোখে-মুখে। কোনো এক আতঙ্ক গ্রাস করেছে সবাইকে।

পরিশেষে ভারাক্রান্ত মনে এতটুকুই চাওয়া আপনাদের কাছে, সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেশতের সর্বোচ্চ সুমহান মর্যাদায় জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। ওনার পরিবারের সবাইকে সুস্থ রাখুন, ধৈর্য ধারনের শক্তি দেন এবং সৎ পথে চলার তওফিক দান করুন। আমিন।

(লেখক : ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের ভাতিজা)

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান : এক হৃদয়বান মানুষের নাম

অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন

সারাদেশ যখন অনৈতিকতায় ভরে গেছে, চারদিকে শুধুঅন্ধকারের হাতছানি, ঠিক তখন এক মানবিকতার উন্নত সংস্কৃতি নিয়ে যে মানুষটি মানুষের মন জয় করেছিলেন চিকিৎসায়, আচরণে, কথায়, কৃষ্টিতে, তাঁর নাম ডাক্তার ইউনুস আলী খান। শুধুশাহজাদপুরের গ্রাম বা মহল্লা নয়, আশপাশের অঞ্চলেও তাঁর নাম শোনেনি বা তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসেনি এমন লোক পাওয়া কঠিন। একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবেন এটা তাঁর পেশা, তাঁকে নিয়ে আবার ঘটা করে লেখার কী হলো?

কতজনই তো মারা যাচ্ছে, তাঁদের নিয়ে লেখার আবশ্যকতা হয়তো নেই, কিন্তু ২০২০ সালে ঢাকার ইমপালস হাসপাতালে করোনায় মৃত এই ডাক্তারকে নিয়ে লিখতে বসেছি এ কারণে যে, এমন একজন মানুষ সচারচার পাওয়া যায় না এবং এমন মানুষকে মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত, যাতে করে মানুষ তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়।

তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। পরিচয় শাহজাদপুরে চিকিৎসা পেশা শুরু করার পর পরই। দিনক্ষণ মনে নেই। তবে ১৯৭২ সাল হবে। যখন থেকে পোতাজিয়া হাসপাতালে চাকরির প্রথম স্টেশনে তিনি সরকারি চাকুরে হিসেবে যোগদান করেন। চিকিৎসার জন্য বার বার গিয়েছি, কতবার তার ইয়ত্তা নেই। এক দিনের কথা আমার বড় মনে পড়ে। বাড়িতে নিয়ে এলাম এক চিতল মাছ, খেতে গিয়ে কাটা ফুটল। দৌড়ে গেলাম আমার বাড়ির পাশের বাসিন্দা এই ডাক্তার সাহেবের কাছে। গিয়ে সব বলতেই তিনি আমার মুখ হা করে দেখে পরীক্ষা করে বললেন কিছুতো নেই। আমি বললাম, সারারাত ঘুমাতে পারেনি। বললেন, এক কাজ করেন, একজন হোমিও ডাক্তারের কাছে যান। ওনারা কাটা বের করতে পারদর্শী। বললাম যে, বলেন কী ? এলাম শাহজাদপুরের সবচেয়ে বড় এ্যালোপ্যাথির ডাক্তারের কাছে, আর পাঠাচ্ছেন অন্যের কাছে। আমার কাছ থেকে ফি নিলেন না।

অনেক দিনই ফি চাননি বা আমিও দিইনি। আবার কখনও আমার স্ত্রীর অসুখে তাঁকে বাসায় নিয়ে এসেছি। যা ভিজিট দিয়েছি তাই নিয়েছেন। একবার তো আমার মাকে গরু দেওয়ায় হার্নিয়া হলো। সেদিন গভীর রাতে আমি খবর পেয়ে তাঁকে জিগারবাড়ীতে নিয়ে যাই। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বলেছিলেন, রাজশাহী হাসপাতালে দ্রুত নিতে হবে। অর্থাৎ যেখানে তিনি দেখেছেন চিকিৎসাটি তাঁর কাছে নয়। প্রাথমিকভাবে দেখে দ্রুত ভালো কোনো হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন।

কেউ কেউ আছেন এমন পরামর্শ না দিয়ে রোগীকে শেষ পর্যন্ত সংকটের মধ্যে ফেলেন। এই যে মানবিক দিকটি তাঁর ছিল যা বিরল নিঃসন্দেহে। তার কোন নির্দিষ্ট ফি ছিল না। ফি কখনও গুনে দেখতেন না। যে যা দিত, তা-ই পকেটে পুরতেন। অনেক মানুষ তাঁর কাছ থেকে শুনে ওষুধ কিনে নিয়ে যেতেন। যে কারণে তাঁকে বলা হতো গরিবের ডাক্তার। আজকের এই বাস্তবতায় তাঁর বিদায়ে শাহজাদপুরবাসী একজন হৃদয়বান মানুষকে হারাল, সে ক্ষতি কত দিনে পূরণ হবে, বলা যায় না।

ব্রিটিশ পরাধীন বাংলার পাবনা জেলার বর্তমান আতাইকুলা থানার পদ্মার পাড়ের জেগে ওঠা চর--চর তারাপুরে ১৯৩৭ সালে তাঁর জন্ম। হারুন-অর-রশিদের ৪ কন্যা ও ৬ পুত্রের মধ্যে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান একজন। পারিবারিকভাবেই সবাই শিক্ষিত, পরিবারটি দিনে দিনে হয়ে উঠেছে অভিজাত। ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকা মানুষটি শাহজাদপুরেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে কুৎসিত রাজনীতি বা যেকোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও তিনি তাঁর সুন্দর মেধা দিয়ে নিজেকে কাঁদামুক্ত রেখেছেন। একজন স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর সাথে আমার রাজনৈতিক পার্থক্য থাকলেও, নৈতিকতার জায়গা থেকে মাঝে-মধ্যেই তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন, নিজেদের দলের অধঃপতিত নেতাদের নিয়ে দুঃখ করেছেন।

একবার তো আমার বাসদ অফিসে গিয়ে হাজির, কী খবর, বলুন তো। বললেন, আমানুল হক স্কুলের পদক পেল, আমাদের একটা সংবর্ধনা দেয়া উচিত। বললেন যে, আপনার কথা মনে পড়ল, তাই এলাম। দেখুন তো কিছুকরা যায় কি না। আমি বয়সে অনেক ছোট হলেও, তিনি কখনও আপনি ছাড়া সম্বোধন করেননি। অর্থাৎ অন্যকে শ্রদ্ধা করা এবং তাঁর বিনয়ী হওয়া প্রমাণ করে, পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উচ্চমান তিনি ধারণ করেছিলেন। কারণ, আমরা জানি বিনয়ী সেই হয় যে জ্ঞানী। সে কথাটি শুনে ছিলাম আমার এক সিনিয়র বন্ধুর কাছে। সিনিয়র বন্ধুকে একবার বললাম, জজ সাহেব সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলেন, কী করা যায় বলুন তো। তিনি বললেন নতুন চাকরি, এখনও চারা গাছ ফল ধরেনি, ফল ধরলে মাথা নিচুহবে, বিনয়ী হবে। কথাটি আজ মনে পড়ে গেল যে, ডাক্তার সাহেব জ্ঞানী এবং নিরহংকার ছিলেন বলেই তাঁর এই বিনয়ী আচরণ ছিল যা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন পদব্রজ বা নগ্নপদ ডাক্তারদের ট্রেইনার। আমার এক আত্মীয়, তিনি সব রকম চিকিৎসা করেন অর্থাৎ এ্যালোপ্যাথি, হোমিও প্যাথি, আয়ুর্বেদীয় এবং প্রয়োজনে ফু দেন। ভাবুন কী অবস্থা! তিনি একবার বললেন, এক বাজারে বসে, আমি কিন্তু এখন বড় ডাক্তার! অর্থাৎ ইউনুস সাহেব যা জানেন, আমিও তাই জানি। পরে জানা গেল তিনিও ডাক্তার সাহেবের কাছে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ছোট-বড় যেই হোক না কেন ডাক্তার সাহেবের যে ভাবমূর্তি ছিল, তাঁর সাথে সম্পর্ক রেখে নিজেকে তাঁর মতো করে ভাবত, যা থেকে বোঝা যায় ডাক্তার সাহেবের নাম বলায় মানুষ বেশ তাঁকেও চিকিৎসক হিসেবে সমীহ করে। শাহজাদপুরে যত ডাক্তার আছেন সব ডাক্তারের ডাক্তার

ছিলেন ইউনুস সাহেব। কোনো চিকিৎসক জটিল সমস্যায় পড়লে ইউনুস সাহেবের শরণাপন্ন হতে দেখেছি। তিনি কখনওই পরামর্শপ্রার্থী ডাক্তারকে হেয় নজরে দেখেননি বরং আনন্দের সাথে পরামর্শ দিতেন। এমন বন্ধুচিকিৎসক আজকের দিনে হাতে গোনা।

তিনি খুবই সদালাপী মানুষ ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে গেলে দেশ নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করতেন। সে আলাপে রাজনীতির চেয়েও মানবিতার বিষয়টি যদিও প্রাধান্য পেত, তবুও বলব এমন একজন দেশচিন্তককে আজ আমরা হারালাম, যাঁর গভীর দেশপ্রেম ছিল। পাবনা জেসিআই (গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউট) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে, এডওয়ার্ড কলেজ থেকে পড়া সমাপ্ত করে, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, চক্ষু চিকিৎসার ওপর ডিপ্লোমা করেছিলেন। তারপর চিকিৎসক হিসেবে তিনি শাহজাদপুরে স্থায়ী হলেন। কেন? পরে মনে হতো--হয়তো চাকরির পাশাপাশি ব্রিটিশ পরাধীন ভারতে ১৭৮৩ সালে পাবনা আর শাহজাদপুর একই সাথে থানার মর্যাদা পায়, হয়তো পাবনা আর শাহজাদপুরের সে বন্ধুত্বের হরসমিথুন তা থেকেই বোধ হয় তার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আরেক বন্ধুর অঞ্চলে এসে আমার বাড়ির কয়েক বাড়ি পর চালা-শাহজাদপুরে দোতলা বাড়ি বানালেন, সামনে রাস্তার দক্ষিণে চমৎকার বাগান করেছেন। ফুলে-ফলে ভরে গেছে বাগানটি। তাঁর মতো করেই প্রকৃতিতে সৌন্দর্য বিলাচ্ছে। সে না থাকলেও অনেকেই মুগ্ধ সৌন্দর্য বিলাচ্ছে। সে না থাকলেও অনেকেই মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থেকে বলছে, ডাক্তার সাহেবের কী সুন্দর বাগান!

সে আরেক দিনের কথা, রাতে বাসদ অফিসে বসে আছি। আশরাফ ভাই, লিয়াকত ভাইসহ অফিস। ভর্তি সবাই গল্প করছে। আমার পার্টি অফিস থেকেই ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলছিলেন আমেরিকায়। যতদূর জানি, ডাক্তার সাহেবের ৩ মেয়ে। বড় মেয়ে ইসমত আরা পারভীন রিতা এবং ছোট মেয়ে প্রিসিলা খান মলি আমেরিকায় থাকেন। মেজো মেয়ে ডা. কানিজ ফাতেমা মিতা থাকেন কানাডায়। যা হোক, আমাকে ফোন ধরিয়ে দেয়া হলো। আমাদের মধ্যে কুশল বিনিময়ের পর অনেক কথা হলো। তার সেই হাসি-খুশি মুখখানি আমার চোখে আজও উজ্জ্বল। শাহজাদপুরে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুছিলেন যেমন--আঃ মতিন (মোহন), সাহা ফার্মেসির মালিকবৃন্দ, আনছার সরকার, লুঙ্কর রহমান চৌধুরী মধু। এদের মধ্যে অনেকেই তার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও প্রতিদিন আমরা দেখতাম ডাক্তার সাহেব বাড়ি ফেরার পথে সাহা ফার্মেসিতে নেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। আমেরিকায় থাকা অবস্থায় যখন কথা বলছিলাম, তখন বার বার বলছিলেন-- আনোয়ার সাহেব, আমার শাহজাদপুর ছাড়া কোথাও ভালো লাগে না। শাজাদপুরে তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় যৌবন ও বার্ধক্য কাটিয়েছেন। শাহজাদপুরের বেশির ভাগ মানুষই জানে না যে, তার বাড়ি আতাইকুলা থানার চর-তারাপুরে। যেখানে মা-বাবার কবরের পাশে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত। পৃথিবীর এই চিরন্তন নিয়মের মধ্যে আমরা সবাই রয়েছি। যার জন্ম আছে,

তার মৃত্যু হবে। শেক্সপিয়ারের 'সেভেন এজেস অব এ ম্যান' কবিতাটি Words
stage And men and women are merely players
They entrance And exit.

এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শেষ হলে তিনি চলে যাবেন। তবে থেকে যায় স্মৃতি। কোনো স্মৃতি সারা পৃথিবীর মানুষ ধরে রাখে তাঁদের সম্পদ হিসেবে, কোনো স্মৃতি ধরে রাখে কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষ। কমরেড মাও সেতুং বলেন, কোনো কোনো মৃত্যু থাই পাহাড়ের মতো ভারী, আবার কোনো কোনো মৃত্যু পাখির পালকের মতো হালকা। ডাক্তার সাহেবের মৃত্যু পাহাড়ের মত ভারী এবং সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে তা স্পর্শ করেছে, দুঃখ দিয়েছে, কেউ বা অলক্ষে হলেও চোখের দু ফোটা জল ফেলেছে। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে শাহজাদপুর অঞ্চলের মানুষ এক হৃদয়বান ডাক্তার হিসেবে, একজন ভালো মানুষ হিসেবে বহুকাল মনে রাখবে। সবশেষে বলতে হয়, সেই মানুষটিই একজন সফল মানুষ, যে মানুষকে দলমত নির্বিশেষে সবাই ভালবাসে। তেমনি একজন সফল মানুষের প্রয়াণে আমরা সত্যিই গভীরভাবে শোকাহত।

এমন হাস্যোজ্জ্বল মানুষটিকে আরও বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের মধ্যে পাওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহলে এ জাতি আরও উপকৃত হতো। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন হৃদয়বান, ভালো মানুষকে হারালাম।

জিরো সুগার

মণিরুল গণি চৌধুরী শুভ্র

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান শাহজাদপুরের চিকিৎসাজগতে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক সুপরিচিত ও প্রিয় নাম। শাহজাদপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে এমন কোনো বাড়ি পাওয়া যাবে না, যে বাড়িতে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান চিকিৎসাসেবা দেননি। একজন ডাক্তার যদি ভালো মানুষ হয়, তাহলে তিনি হয়ে ওঠেন অনন্য। তেমনি একজন অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। রোগী তাঁর কাছে গেলে, তাঁর সুন্দর হাসি আর আন্তরিক ভাষা রোগের টনিক হিসেবে কাজ করত। তিনি কারও কাছে থেকে চিকিৎসা ফি চেয়ে নিতেন না। যে যা দিত, তাই তিনি পকেটে রেখে দিতেন দেখতেন ও না, বরং গরিব রোগীদের ওষুধ কিনে দিতেন। এ রকম অনেক ভালো গুণ তাঁকে মানুষের কাছে অনন্য করে তুলেছিল।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ছিলেন আমার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মকবুল হোসেন চৌধুরীর বন্ধুও রাজনৈতিক সহচর। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ছিলেন বঙ্গবন্ধুপরিষদ শাহজাদপুর শাখার সভাপতি, আর আমার বাবা ছিলেন ওই কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এক সাথে পরিচালনা করতেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল মধুর। তাঁদের আড্ডার জায়গাও ছিল ডাক্তার সাহেবের চেম্বার। বিকেল হলেই চেম্বারে শুরু হতো বয়সীদের আড্ডা, আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রাজনীতি, সমাজনীতি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির উপায় বের করাসহ নানা বিষয়। এমনই একটা আড্ডায় আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল ২০১৮ সালের কোনো এক বিকেলে। বাবার চোখে সমস্যা হয়েছিল, তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের চেম্বারে। আমি তাঁকে চক্ষুহাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের কাছেই যাবেন। যা হোক, তাঁকে নিয়ে গেলাম সেখানে। ডাক্তার সাহেব এত আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন যেন পরম আত্মীয়। এরপর ধীরে ধীরে বয়সীরা আরো দশ বারোজন এসে জড়ো হলেন। অনেক কথাবার্তার পর ডাক্তার সাহেব চায়ের অর্ডার দিলেন। একমাত্র ছোট মানুষ আমি ছাড়া সবার চা জিরো সুগার। এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হলো।

(লেখক : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, শাহজাদপুর উপজেলা শাখা)

(নোট : নিচের লেখার শিরোনাম নেই)

'ইউনুস কাকু' 'পিতৃব্য' শব্দটির অর্থ পিতার সমান। শব্দটি সাধারণত মামা, চাচা, খালু, ফুপাদের মতো নিকট-আত্মীয়দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে আত্মীয়দের নামের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম ও হিন্দু দুটি সংস্কৃতি প্রচলিত আছে। যেমন : চাচা--কাকা, খালু--মেসো, ফুপা--পিসে, ভাই--দাদা, ভাবি--বৌদি ইত্যাদি। মুসলিমরা চাচাকে আরো একটু আপন করে চাচু বা চাচ্চুবলে, অপরদিকে হিন্দুরা কাকাকে বলে কাকু বা কাক্কু। আমার জন্মস্থান শাহজাদপুর কিছুকাল পূর্বেও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। এজন্য এখনও আমরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও চাচাকে ভালোবেসে কাকা ডাকি। আমার জন্য তেমনি একটি নাম 'ইউনুস কাকু', যাঁর সাথে আমার নিজস্ব সরাসরি কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি নেই। এ জন্যই এই গৌড়চন্দ্রিকা। কাকুর

৫০

সম্পর্কে আমার তেমন বিশেষ কিছুজানা নেই, বলারও নেই। ওনার কাছাকাছি আসার যারা সুযোগ পেয়েছেন বা শাহজাদপুরবাসী তাঁর কর্ম, অবদান সম্বন্ধে অবগত আছেন। 'চিকিৎসাসেবার বাতিঘর' হিসেবে তিনি এলাকায় পরিচিত ছিলেন। আমার আব্বা কাকুর চেয়ে বয়সে ১৫/১৬ বছরের বড় ছিলেন। পুরনো দিনের শিক্ষিত, বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সবাই আব্বাকে জানত এবং সম্মান করত। আব্বার হৃদরোগ, এজমা, ডায়াবেটিসসহ নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতা ছিল। মাঝে মাঝেই বিশেষত শীতকালে অসুখের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। এ সময়টায় ডাঃ মোঃ ইউনুস, ডাঃ সাঈদ, ডাঃ আনছার এবং ডাঃ জাহাঙ্গীরের অনেকটা নিয়মিত যাতায়াত ছিল আমাদের বাসায় আব্বার অসুস্থতার জন্য। ওনারা দীর্ঘসময় ধরে আব্বার সাথে গল্প করতেন,

যে গল্প চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের বাইরের গল্প। সেই সময়ে আমি মাধ্যমিকের ছাত্র ছিলাম। অনেকদিন আমি নিজেও ওনাদের ডেকে এনেছি। এক রিকশা বা বাইকে আসতাম, শারীরিক সংস্পর্শে থাকতাম। পথিমধ্যে কিছুবিক্ষিপ্ত কথা হতো, যা এখন মনে নেই। এমন ২-৩ দিন ঘটেছে যখন চারজন ডাক্তারই একসাথে বাসায় এসেছেন, এমনটা ঘটলে ভয় পেয়ে যেতাম। এখন বুঝি এর নাম 'মেডিকেল বোর্ড'। আমাদের বাসায় কোনো এক সময় কাজ করত কাছাকাছি বাড়ির একজন মহিলা। আমি তখন ঢাকায়। একবার বাড়ি গিয়ে শুনি তিনি মারা গেছেন এবং তার মেয়ে বাসায় কাজ করছে। মেয়েটাও বড় তখন ৩০-৩৫ বছর হবে। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম তার মা কি কারণে মারা গেল। সে কী কী অসুখের কথা বলল, তা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমি বললাম, চিকিৎসা করান নাই। তার উত্তরটা আমার এখনও মনে আছে--'কী যে কন, তা কি আর বাকি রাখছি, ইউনুস

ডাক্তার পর্যন্ত দেখাইছি'। এই হলো আমাদের 'ইউনুস কাকু'। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আল্লাহর পরে এই দুনিয়াতে আস্থার অপর নাম। দোয়া করি সাধারণ মানুষের ভালোবাসার মতো মহান আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হোন ওপারে।

মুঈদ সিদ্দিকি

(নোট : নিচের লেখার শিরোনাম কী? লেখাটা বাণীর মতো মনে হচ্ছে। প্রফেসর মেরিনা জাহান কবিতা কি বাণী দেওয়ার মতো কেউ?)

গরিবের ডাক্তার খ্যাত 'ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মারকগ্রন্থ' 'তুমি রবে নিরবে' প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাই।

আমাদের চারপাশে এমন নিভৃতচারী, প্রচারবিমুখ অনেক মানুষ রয়েছেন, তাঁদের কয়জনের খবর আমরা রাখি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মফস্বলে, গ্রামে-গঞ্জে এমন মানুষেরা নিরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন। সেসব গল্পের সবটুকুমানুষ জানতে পারে না। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের কর্মক্ষেত্র শাহজাদপুরের সাধারণ মানুষ তাঁদের আত্মপলব্ধি থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ১৯৬৯ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তখন সরগরম এ ভূখণ্ডের নিপীড়িত মানুষ। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভের মাত্র দুই বছর পরেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মানুষ মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেয়। শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। যুদ্ধাহত সূর্যসন্তানদের সেবা নিশ্চিত করেছেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একজন অসামান্য অনুসারী। মুক্তিযুদ্ধের পর 'তরুণ ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়ার' বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ সালে তিনি শাহজাদপুরের পোতাজিয়া সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগ দেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করেছেন। জাতির পিতার মতোই হৃদয়ের বিশালতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে কাছে টেনেছেন দলমত নির্বিশেষে। শাহজাদপুরের গ্রাম-গ্রামান্তরে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও সাইকেলে চড়ে রোগীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রাচুর্য কিংবা বিলাসিতা নয় বরং নির্মোহ জীবনকেই করেছেন আলিঙ্গন। আকর্ষণীয় সরকারি

চাকরি ছেড়েছের। ছেড়েছেন তথাকথিত স্বপ্নের দেশ আমেরিকার অভিবাসনের হাতছানি। গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মাঝে মিলেমিশে থাকার আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাইতো করোনা-মহামারিতে একজন ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পৌঢ়ত্বকে কোনো অন্তরায় মনে করেননি। নিয়মিত রোগীর সেবা দিয়ে গেছেন।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের যাপিত জীবন এই স্মারকগ্রন্থে উঠে আসুক। 'তুমি রবে নীরবে' গ্রন্থটির পরতে পরতে তাঁর জীবনালেখ্য থরে থরে সাজান থাকুক। এই

স্মারকগ্রন্থ নিঃসন্দেহে তরুণ প্রজন্মের চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখবে। আমি এ গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মেরিনা জাহান কবিতা

একজন অভিভাবককে হারালাম

চয়ন ইসলাম

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের সাথে আমার পরিচয় প্রায় তিন দশকের। শাহজাদপুরের স্থানীয় রাজনীতির সাথে আজ থেকে প্রায় ৩০-৩১ বছর আগে আমার আব্বা প্রফেসর মযহারুল ইসলামের সাথে যখন কাজ শুরু করি, তখন থেকেই তাঁর সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা শুরু। তিনি যেমন শাহজাদপুরের একজন বিশিষ্ট সম্মানিত চিকিৎসক ছিলেন, তেমনই ছিলেন প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীনতার স্বপক্ষের একজন মানুষ। তাঁর সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল অনেকটা পিতা-পুত্রের মতো। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন, তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের আপনজন। তিনি সবসময় আমার শাহজাদপুরের রাজনীতির পথ চলায় সুপরামর্শ দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন, সহযোগিতা করেছেন। আমি দুইবার শাহজাদপুরের এমপি থাকার সময় তিনি সর্বতোভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, অনেক ভালো কাজের তিনি প্রশংসা করেছেন, অনেক ভালো কাজ করতে তিনি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

কিছু মানুষের জন্ম হয় দেশকে এবং দেশের মানুষকে শুধুদেওয়ার জন্য, তেমনি একজন মানুষ ছিলেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। শাহজাদপুরের দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানের এবং শ্রদ্ধার। চিকিৎসক হিসেবে যেমন তিনি ছিলেন সবার কাছে প্রায় সমান গ্রহণযোগ্য এবং মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন সবার কাছে প্রিয়। মৃদুভাষী ডাঃ ইউনুস শাহজাদপুরের মানুষের কাছে একজন সজ্জন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি শুধু একজন নামকরা চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজসচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি সব সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে চলতেন, তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন মানুষ।

তাঁর অসুস্থতা এবং মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শুধু আমি বা আমাদের পরিবারের সদস্যরাই নয়, শাহজাদপুর উপজেলা তথা সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলার এমনকি পাবনা জেলার তাঁর যাঁরা রোগী বা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরা সবাই গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন। তিনি হয়তো পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তির, তাঁর মতো একজন স্বনামধন্য চিকিৎসকের আরও কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার ছিল। করোনার মহামারি সময়ে তাঁর চলে যাওয়া শাহজাদপুরবাসীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা সব সময় তাঁর অভাব বোধ করব। তিনি আমাদের মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন, তিনি সবসময় সৎ পরামর্শ

দিতেন এবং সমস্ত ভালো কাজের সাথে থেকে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কোনো পদ-পদবীর লোভ তাঁর ছিল না। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি রাজনীতি করতেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করাই ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম। তিনি নিজের জন্য কিছুই করতেন না, সব কিছুই করতেন দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য বিশেষ করে শাহজাদপুরের মানুষের জন্য। তাঁর কর্মের কারণে শাহজাদপুরের মানুষ তাঁকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবেন।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলামের মৃত্যুর পর, শাহজাদপুরের যে কয়েকজন মানুষকে মুরুব্বি হিসেবে পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ ইউনুস। তিনি আব্বারও অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। আব্বা তাঁকে অনেক পছন্দ করতেন। তিনিও আব্বাকে খুবই সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সর্বাবস্থায় আমাকে রাজনীতির মাঠে সহযোগিতা করেছেন সুপরামর্শ দিয়েছেন। যেমনটি তিনি আমার আব্বা প্রফেসর মযহারুল ইসলামকেও দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি বা আমরা শুধু তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হলাম না, আমি একজন অভিভাবক হারালাম। তাঁর মতো একজন সুশিক্ষিত এবং মেধাবী মানুষের সুপরামর্শ থেকে আজীবনের জন্য বঞ্চিত হলাম যা আমাদের, জন্য বা আমার জন্য মেনে নেওয়া খুব কষ্টের। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতেই হচ্ছে, মৃত্যু অবধারিত, তিনিও আমাদের মাঝ থেকে চলে গিয়েছেন চিরদিনের জন্য। কিন্তু যে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আমরা সেটাকে নিয়েই সামনে এগিয়ে যাব। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে ভালো কাজের জন্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ পাক যেন ডাঃ ইউনুস আলী খানকে বেহেশত নসিব করেন।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য, ৬৭- সিরাজগঞ্জ -৬ (শাহজাদপুর)।

পোতাজিয়াতে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের ১৫ বছর

আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হক

আমার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় এডওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে (তৎকালীন কলেজ)। যদিও তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, তবুও তাঁর সাথে আমার রাজনৈতিক সূত্রে পরিচয় ঘটে। আমরা দুজনেই ছাত্রলীগ করতাম। আগে তিনি জিসি ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন এই গ্রামের অপূর্ব কুমার গোস্বামী (বিএসসি) এবং তাঁর ভাই অনন্ত কুমার গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি পোতাজিয়া হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। সময়টা সম্ভবত ১৯৭৩ সাল। বারীত বরণ ঘোষ (কালো বাবু) তাঁর সহপাঠী হওয়ার সুবাদে পোতাজিয়া ঘোষবাড়ির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সখ্য গড়ে ওঠে, পাশাপাশি রাউতারা ঘোষ পরিবারের সাথেও তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাশাপাশি এই গ্রামের জনসাধারণের সাথে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছিল এক স্ত্রী, দুই মেয়ে রিতা ও মিতা, সাথে ছিল তাঁর ভাতিজা এবং ভাতিজি। রিতা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিল। প্রাথমিক পরীক্ষায় সে পোতাজিয়া ইউনিয়নে প্রথম স্থান লাভ করে। ডাক্তার সাহেবের তৃতীয় কন্যা মলির জন্ম এই গ্রামে। মলির বয়স যখন দুই বছর, তখন ডাক্তার সাহেব চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে শাহজাদপুরে চলে যান।

চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, আন্তরিক ও সময়নিষ্ঠ এবং দ্রুতই তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের দায়িত্ব শেষ করে, অবসরে তিনি শাহজাদপুরে সাথী মেডিকেল হলে প্র্যাক্টিস করতেন। রোগীদের কাছে তাঁর চাওয়ার কিছুই ছিল না। রোগীরা যা সম্মানী দিতেন তাই তিনি নিতেন। আর কেউ অসমর্থ হলে তাঁর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ না করে, বরং তাঁকে অর্থ-সাহায্য করতেন। শাহজাদপুরের অনেক বিশিষ্ট জনের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। প্রয়াত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিনের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর অনুরোধে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সিরাজগঞ্জ চক্ষুহাসপাতালে রোগী

দেখতে যেতেন। সেখান থেকে রোগী দেখার পর অনন্ত কুমার গোস্বামীর বাড়িতে আমরা রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত আড্ডা দিতাম। আমি নিজে, আমাদের প্রয়াত সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মতিন মোহন সাহেব, অনন্ত কুমার গোস্বামী এবং যাকে নিয়ে আজকের এই লেখা আমার প্রিয় মরহুম ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। আমদের আড্ডাতে বেশ কয়েক দফা চা চক্র চলত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তিনি এতই সফলতার

পরিচয় দেন যে, তৎকালীন সরকার তাঁকে চক্ষুবিষয়ের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠান। সেখান থেকে তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে দুই মাস পর দেশে ফিরে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁকে রিসিভ করার জন্য ভাবি সাহেবা, আমি নিজে আমার প্রিয় মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন মোহন সাহেব (চেয়ারম্যান) এবং অনন্ত কুমার গোস্বামী ছিলেন। ১৯৮১ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁকে রিসিভ করার জন্য প্রথম সারির নেতাদের সাথে আমাদের পোতাজিয়া গ্রাম হতে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান সাহেব এবং অনন্ত কুমার গোস্বামীও ছিলেন। পোতাজিয়া হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় যখন ওষুধ স্বল্পতা দেখা দিত, তিনি আমাকে সাথে করে পাবনা সিভিল সার্জনের অফিসে গিয়ে পর্যাপ্ত ওষুধ নিয়ে আসতেন। এমনকি তিনি রাজশাহীতে গমন করার সময় আমাকে তাঁর সফরসঙ্গী করতেন।

একবার রাজশাহী থেকে ফেরার সময় ট্রেনের মধ্যে আজিম চৌধুরীর (দুলাই, পাবনা) নাতির সাথে আমাদের আলাপ হয়। আমরা যখন ঈশ্বরদী স্টেশনে আসি, তখন রাত প্রায় ১২টা। ওষুধের বাক্সগুলো নামানোর জন্য কুলি এগিয়ে আসে এবং ১০০ টাকা দাবি করে বসে, আমরা এত টাকা দিতে নারাজ ছিলাম এবং আমি ডাক্তার সাহেবকে প্রস্তাব দিই যে আপনি ট্রেন থেকে মালগুলো নিচে আমার হাতে ধরিয়ে দিন আমি ওগুলো নিরাপদ জায়গাতে রাখি, কথা অনুসারে কাজ হলো। তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় করতে নারাজ ছিলেন। পরে অবশ্য কুলিরা ভুল বুঝতে পারে এবং অর্ধেক পারিশ্রমিকে মালগুলো উল্লাপাড়াগামী ট্রেনে তুলে দেয়। সকাল ৭ টার সময় আমরা উল্লাপাড়াাতে পৌঁছে যাই। তৎকালীন সময়ের হাফিজ সাহেবের গাড়িতে আমরা শাহজাদপুরে আসি এবং পরে মালটানা ভ্যানে হাসপাতালে আসি।

ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান চিকিৎসাসেবায় ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ। মহামান্য সরকার তাঁকে ডেপুটি সিভিল সার্জন হিসেবে পদোন্নতি দেন এবং তাঁকে সিরাজগঞ্জে বদলি করেন। কিন্তু তিনি পোতাজিয়ার মানুষরাও অনেক ভালোবেসেছিলেন। তাই তিনি এই গ্রাম ছেড়ে যেতে চাননি। এই গ্রামের মানুষরাও তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছিল। তাই আমি নিজে, ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান আমার প্রিয় মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন মোহন সাহেব (চেয়ারম্যান) ও অনন্ত কুমার গোস্বামী চারজন মিলে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় যাই এবং তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হই যে, ডাক্তার সাহেবকে কোনো মতেই পোতাজিয়া থেকে যেন বদলি করা না হয়। তিনি আমাদের কথা রাখলেন এবং তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দিয়ে মেডিসিন স্পেশালিষ্ট পদ সৃষ্টি করে সেই পদে ডাক্তার সাহেবকে নিয়োগ দিয়ে এই হাসপাতালেই রাখেন। তখন আমরা ডাক্তার সাহেবের চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক লক্ষ করলাম এবং আমরাও অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। তিনি এই পদে তিন বছরেরও বেশি সময় কর্মরত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার হাতে বদলির আদেশ আসল এবং তিনি বুঝতে পারলেন আর কোনো

মতেই এই গ্রামে থাকা আর সম্ভব নয়, তখন তিনি মনঃক্ষুন্ন হয়ে চাকরিই ছেড়ে দিলেন। এরপর তিনি শাহজাদপুরে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস শুরু করেন এবং অনেক সুনাম অর্জন করেন।

রাজনৈতিক জীবন : ছাত্রজীবনে ইউনুস সাহেব বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রলীগ করতেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মজীবনেও তিনি পর্দার আড়ালে থেকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিতেন এবং পকেটের টাকা খরচ করে দলীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। শাহজাদপুর সরকারি কলেজ (তৎকালীন শাহজাদপুর কলেজ) ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জন্য। বেশির ভাগ খরচ পোতাজিয়া থেকে আমরাই বহন করতাম।

যেহেতু তিনি সরকারি চাকরি করতেন, সেজন্য গোপনে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন আর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ফলে, তাঁর আর কোনো বাধাই রইল না এবং তিনি সক্রিয় ও প্রকাশ্যে রাজনীতিতে চলে আসেন। তাঁর চেম্বারে যখন রোগী আসতেন তখন তিনি তাঁর দলের পক্ষে আনার জন্য তাঁদেরকে সুন্দর যুক্তি দিয়ে নৌকায় ভিড়ানোর চেষ্টা করতেন। এভাবে চলতে থাকার এক পর্যায়ে আমাদের উপজেলার গর্ব ডঃ মযহারুল ইসলাম (তৎকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি) শাহজাদপুরে এসে আমাদের চারজন এবং সে সময়ের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন। আমরা সবাই তা সমর্থন করি এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনি ঢাকায় ফিরে যান এবং বঙ্গবন্ধুপরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিচারপতি কে এম সোবহান এবং আরও কিছু পদস্থ কর্মকর্তাগণ। শাহজাদপুরে আসার জন্য মত পোষণ করেন এবং নির্ধারিত দিনে শাহজাদপুর সরকারি কলেজ মাঠে শহিদ মিনার চত্বরে বিশাল এক মিটিং হয়। উক্ত মিটিংয়ে ডঃ মযহারুল ইসলামের সুযোগ্য সহোদর ডঃ মোঃ আব্দুল খালেক সাহেব উপস্থিত ছিলেন এবং জননেতা চয়ন ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর একটি প্যানেল তৈরি করা হয়। উক্ত প্যানেলের সভাপতি পদে ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানকে সভাপতি হিসেবে সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। উক্ত প্যানেলটি পাঠ করেন পোতাজিয়া গ্রামের অনন্ত কুমার গোস্বামী। প্যানেলটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১ জন।

বিঃ দ্রঃ আমার স্মৃতিপটে যা মনে ছিল তা আমি লিখলাম। ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়।

আমার দেখা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান

এ এম আব্দুল আজীজ

মানুষ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকে তাঁর রেখে যাওয়া কর্মের কারণে। ডাঃ ইউনুস সে রকমরে একজন মানুষ। ১৯৬০-৬১ সালে এডওয়ার্ড কলেজে আমি যখন আইএসসি পড়ি, ডাঃ ইউনুস আলী খান তখন একই কলেজে বিএসসি পড়েন। বিএসসি পাশ করে তিনি এমবিবিএস-এ ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে মানবসেবা শুরু করেন। প্রথম থেকেই তিনি জনদরদি চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি পান। শাহজাদপুরে অঞ্চলে তিনি পোতাজিয়া হাসপাতালে টিএইচএ হিসেবে নিয়োগ পান। যোগদানের দিন থেকেই তিনি তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সেবার জন্য এই অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন। বড় ডাক্তার হিসেবে এই অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন। ন্যায়-নীতির প্রশ্নে তিনি কখনও আপস করেননি। আমার বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেনকে (জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭৬ সালে ২১ শে রমজানে অমানুষিক নির্যাতন করে উপজেলা চত্বরে উল্টো করে ঝুলিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ঝুলন্ত অবস্থায় মারা যাওয়ার পর, সেনা-সদস্যরা ডাঃ ইউনুস আলী খানের চেম্বারে নিয়ে চাপ দিতে থাকেন এই বলে যে, তাঁর কাছে মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেনকে জীবিত অবস্থায় আনা হয়েছে এবং তাঁর সামনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আদর্শবান ডা. ইউনুস আলী খান জীবিত সার্টিফিকেট দেননি। সেনা-সদস্যদের শত চাপেও তিনি মাথা নত করেননি। সেনা-সদস্যরা ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী সময়ে সিরাজগঞ্জ নিয়ে যান এবং সেখান থেকে আমার ভাইয়ের লাশ আমরা এনে কাদাইবাদলাতে দাফন করি।

ডাঃ ইউনুস আলী খান টিএইচএ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনগণকে সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য তিনি টিএইচএ পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষের সেবা করে গেছেন। দশ টাকার ভিজিট থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার জানামতে কোনদিন কোন রোগী কত টাকা ভিজিট দিল, তা গুনে দেখেননি। সোজা পকেটে রেখে দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে এমনই তিনি করে গেছেন। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে আর কোনো ডাক্তার করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন গরিব রোগীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করে তার কাছে নিয়ে গেছি, উনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বলতেন, "আমারও একটু কন্ট্রিভিশন থাক।" এই বলে ওই সমস্ত রোগীদের কাছ থেকে তিনি কোনোরূপ ভিজিট নেননি। উপরন্তু পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য কোনো ধরনের খরচও নেননি। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি মুক্তিযুদ্ধের নিঃস্বার্থ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার

পর থেকে এ দেশের উন্নতির জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও নীতি নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করে গেছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা'সহ বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত গ্রন্থ নিয়মিত পাঠের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, শাহজাদপুর উপজেলা শাখা অফিসে একটি আধুনিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। আমাদের সবার উচিত তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পাঠাগারটি উদ্বোধন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জানার পথ সুপ্রশস্ত করে দেওয়া। সবশেষে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মহান আল্লাহতালার কাছে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদানের আকুল আবেদন করে শেষ করছি।

(লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ)

(নোট : নিচের লেখাটা বুঝিনি। মূল লেখার সঙ্গে মেলাতে হবে।)
রহিমা পারভীন লিপি
ডা: মো: ইউনুস আলী খানের
মেঝ ভাই ডা: সেকেন্দার আলী
খানের ২য় মেয়ে

আমি রহিমা পারভীন মিলি, ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খানের মেজো ভাই ডাঃ সেকেন্দার আলী খানের জীবিত দ্বিতীয় সন্তান। বড় আব্বা ও চাচারা শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহভাজন, কিন্তু ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান কাকা আসার পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে এতিম হলাম। কিন্তু মাথার ওপর দেখলাম একটা ভরসার হাত। হাতটি আমার প্রিয় কাকা মোঃ ইউনুস আলী খানের। আব্বাকে যখন মেরে ফেলে, তখন আমি প্রথম শ্রেণিতে পড়ি, আর কাকা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। ১৯৭০ সালে ইন্টার্নশিপ শেষ করে পাবনা সদর প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করেন। ১৯৭১ সালে আমি পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছি, কাকা আমাদের পাবনা ভাড়া বাসার নিয়ে যান। স্কুলে ভর্তি করাবেন তখন নানা এসে আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন থাকার পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শান্তাহার হয়ে ট্রেনে ঈশ্বরদী রেলস্টেশনে নেমে দেখি অশান্ত পরিবেশ, পাবনা যাওয়ার যানবাহণ ঠিক মতো চলছে না। অনেক চেষ্টার পর একটা বাস পেয়ে নানা আমাদের ওই বাসে করে পাবনায় নিয়ে আসেন। আমাদের দেখে কাকা চমকে যান পারস্পরিক খোঁজ না নিয়ে আজকের দিনে রওয়ানা দেওয়াটা ঝুঁকি হয়ে গেছে। কারণ, ঈশ্বরদীতে সকাল থেকে কাটাকাটি শুরু হওয়ার সংবাদ কাকা পেয়েছেন। সন্ধ্যাতেই শুরু হলো পাকিস্তানি জান্তার হামলা, প্রচণ্ড গুলির সঙ্গে আমরা কান্নাকাটি শুরু করলে, কাকা খালা আমাদের মুনুর্ষ চেপে ধরে রান্না করা খাবার ফেলে পিছন দিয়ে পালিয়ে মেইন রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা বাড়ির আশ্রয় নিয়ে চৌকি ও টেবিলের নিচে থাকি। ভাব হলেই লুকিয়ে ছুরিয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে গ্রামের বাড়ির পথে রওয়ানা হলাম। সেই ভয়াভয় কষ্টের সময় এই চোকাই আমাদের ভরসা। আমাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে পাওয়া অনেক অভিজ্ঞতা হলো। তার পর চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দেশ স্বাধীন হলো। কাকা আমাদের নিয়ে পোতাজিয়া থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাসায় নিয়ে আসেন। পড়াশোনা পোতাজিয়া হাইস্কুলে শুরু হলো। কাকা সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিকে ঝেড়ে ফেলে রাতে আমাদের পড়াতে বসতেন। তার পর একসঙ্গে খেতেন। অবাক হয়ে দেখতাম, অতি শান্ত কাকার হাস্যজ্জ্বল শান্ত সৌম্য মুখ যেখানে আছে গভীর মমতা। প্রাচুর্য ছিল না, ছিল কাটাখালার প্রানক্তি প্রচেষ্টা। তাঁদের মুখের দিতে তাকিয়ে আমি কিছু চাইতাম না। আমার পঞ্চম কাকা ছোট কাকা ও আমরা ছয় ভাই-বোন আর খালা-কাকার তামায় এই বিশাল পরিবারকে সবাই এই বাসায়।

এসএসসির পর আমার বড় বোনকে রাজশাহী সিটি কলেজে এবং পরের বছর আমাকে পাবনা মহিলা কলেজে ভর্তি করে দেন। আমি পড়াশোনায় তেমন ভালো ছিলাম না। তাই নানার পছন্দের এক জীবন সংগ্রামী ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। সে তখন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। ওই সময় কাকার পক্ষে ১০ হাজার টাকা বের করার সাধ্য ছিল না। দৈনন্দিন রোজগার ও বেতনের টাকায় চলছিল এত বড় পরিবার। তার পরও ধার করে কাকা খালা আমার স্বামীর ডাক্তারি পড়ার খরচ বহন করেন। যেহেতু আমার স্বামী ছাত্র, তাই আমি কাকা খালার কাছেই থাকলাম। আমার প্রথম সন্তান এই বাসাতেই হয়। শুরুতেই নানার সব চাইতে বেশ পেলো কেননা বাবা তখন শেষ বর্ষের ছাত্র। এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্ন শেষে মেডিকেল অফিসার হিসেবে পোস্টিং করালেন কাকা। খালা কাকা বাসা ভাড়া করে শাহজাদপুর চলে গেলেন। আমরা পোতাজিয়ার বাসায় থাকলাম ৫ বছর। বাসা নিয়ে অন্যত্র গেলেও তাদের ছত্রছায়ায় আমরা চলতে লাগলাম। কাকা প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন তাঁর প্রিয় নাতিকে নিয়ে যেতে। নাতির ও হয়েছিল নানা-নানী নেওটা। কখনও মনে হয়নি আমরা আলাদা। আমাদের বাসায় একরাতে ডাকাত হামলা করলেও, আমার স্বামী উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় ডাকাতরা পালিয়ে যায়। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ভয় পাওয়া লক্ষ করে আমার স্বামী এক দিনের মধ্যে বাসা ভাড়া নিয়ে শাহজাদপুর চলে এলো।

পরবর্তীতে কাকা শাহজাদপুর বাড়ি কিনলেন, পরে আমরাও জায়গা কিনে বাড়ি করে উঠে পড়লাম। কাকার সিদ্ধান্তই ছিল আমাদের সিদ্ধান্ত। কেননা কোনো সিদ্ধান্তই আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন না, শুধু বিজ্ঞ মতামত নিতেন। আমরাই বরং কাকার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে ছিলাম। বড় ছেলেকে উচ্চ মাধ্যমিকের পর ওর বাবা ইংলিশ অনার্সে ভর্তি করে দেন। ছেলের ইচ্ছা না থাকলেও, বাবার সামনে না বলার সাহস পায়নি। নাতির সঙ্গে একান্তে কথা বলে আগ্রহের বিষয় ছেলে আমার ছোট ভাই ডা: দুলালকে দিয়ে খোঁজ নিয়ে ভুঁইয়া কম্পিউটার্সে, কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি করে জামাইকে টেলিফোনে বোঝালেন তোমার প্রথম সন্তান অনীহা নিয়ে চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ে ভালো চাইতে খারাপই হওয়ার সম্ভবনা তাই ইচ্ছামতো তাকে ভর্তি করেছি। মনটা খারাপ হলেও ওর বাবা মেনে নেয়। ঢাকাতে থাকার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় আমার বড় ছেলে কাকার ছোটো মেয়ের বাসায় থেকে পড়াশোনা শেষ করে। মজার বিষয়, আমার সেই ছেলে অনার্স শেষে বৃত্তি নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মাস্টার্স ও আয়ারল্যান্ড থেকে পিএইচডি কমপ্লিট করে এ দেশেরই আরেক ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক করেছে। এমন দূরদর্শী মাথার উপরে নিশ্চিত ছায়া হঠাৎ করেই চলে গেলেন।

একটা মানুষের অভাবে আমাদের এই পরিবারটা তছনছ হারগুলো এমন একটা অসুখ আল্লাহ দিলেন যে, গত ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহাতেও তাঁর পা ছুয়ে আশির্বাদ নিতে পারলাম না। এমনকি তার প্রাণপ্রিয় সহধর্মিনী তার মুখটা শেষ দেখা দেখতে পেলেন না। লাসবাহী গাড়ি আমার একান্ত ইচ্ছায় আমার বাসার গেটে আনলে কাঁচের ভিতর মুখটা দেখে মনে হলো গুমিয়ে আছে অনেক ডাকলাম। কান্নায়

ভেঙ্গে পড়লাম তবুও কাকাকে কেউ না মানেনা টানি আর কোনদিন তার পদধুলি আমার বাসায় পড়বে না তবুও মন মানেনা এখনও মনে হয় কাকা আমার বাসায় এসে দরদভরা কণ্ঠে ডাকবেন লিলি। খোদার কাছে প্রার্থনা আমার এই সবার সেরা ভালো মানুষ কাকাকে বিনা বিচারে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

(নোট : নিচের লেখাটা বুঝিনি)

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মরণে টেলিফোনিক কনফারেন্সের মাধ্যমে ফ্লোরিডায় একটি দোয়ার অনুষ্ঠান : চাপা রহমান, ফ্লোরিডা

গত ৩ আগস্ট, ২০২০, সোমবার ফ্লোরিডার ওকালা শহরের ডাঃ ইসমত আরা পারভীন তাঁর বাবা প্রয়াত ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান স্মরণে টেলিফোনিক কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ৪০ দিন অতিক্রান্ত হওয়া উপলক্ষ্যে পারভীন তাঁর প্রাণপ্রিয় বাবার স্মরণে এই দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় চল্লিশা। ভারতের সিস্টার ফেরদৌস এই দোয়ার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। দূপুর তিনটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং বিকেল প্রায় পৌনে ৫টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমি ফ্লোরিডার গেইন্সভিল শহর থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ, ফ্লোরিডার ওকালা, অর্ল্যান্ডো ও গেইন্সভিল শহর, আরিজোনা, ওয়াসিংটন ডিসি, যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহর এবং কানাডা থেকেও অনেকে এই টেলিফোনিক দোয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।

ইউনুস চাচা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে এমবিবিএস পাশ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে চক্ষু বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি গত ৫০ বছর ধরে সপ্তাহের প্রতিটি দিন নিরলসভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছেন। গোটা শাহজাদপুর উপজেলার জন্য তিনি ছিলেন সম্মানীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে চক্ষুবিশেষজ্ঞ হিসেবে পাবনা ও সিরাজগঞ্জজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান ছিলেন সৎ, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী একজন চিকিৎসক। তিনি ছাত্র, মুক্তিযাদ্ধা ও দরিদ্রদের বিনা পয়সায় চিকিৎসাসেবা দিতেন।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক পরিষদ স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'অমর একুশে সম্মাননা পদক' প্রদান করে। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংকটকালে অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থাকলেও, ৭৬ বছর বয়স্ক ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী খান তাঁর প্রবাসী মেয়েদের অনুরোধ উপেক্ষা করে রোগী দেখা চালিয়ে যান। দুঃখজনকভাবে এক পর্যায়ে তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। ঢাকার ইমপালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে, ২৪ জুন সকাল ১১টায় তিনি মারা যান। ইউনুস চাচার মৃত্যুর পর তাঁর বড় কন্যা ফ্লোরিডায় অবস্থানরত পারভীন প্রচণ্ড শোকে ভেঙে পড়েন। তখন আমি তাঁকে লিখেছিলাম এই চিঠি তাঁর বাবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

"সুপ্রিয় ছোটবোন পারভীন,

প্রথমে জানাই তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

আমাদের ফ্লোরিডার গেইন্সভিলের আজকের সকালটি খুবই মেঘলা। এত বেলা হয়ে গেল এখনও সূর্য ওঠেনি। তোমাদের ওকালা শহরে এখনও সূর্য উঠেছে কি না আমি জানি না। আমি জানি তোমার মনটাও অনেক মেঘলা এবং তুমি মানসিক যন্ত্রণায় কাতর। ২৪ জুন তুমি তোমার প্রাণপ্রিয় বাবা ডক্টর ইউনুস আলী খান চাচাকে হারিয়েছ। তিনি হার্ট-অ্যাটাক করে মারা গেছেন।

এ পৃথিবীতে আমাদের বাবা-মায়ের চেয়ে এত আপন আর কে আছে? তাঁদের কোনো একজন যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তখন জীবনটাকেই অর্থহীন মনে হয়। তোমার ব্যথায় আমি সমব্যথী। সেদিন রাতে তোমাকে যখন কল করলাম, তুমি এমন ভাবে কাঁদলে আমার মনটা তখন খুব খারাপ হয়েছে। আমি জানি এ ব্যথা কেমন ব্যথা! কিন্তু বোন তোমাকে তো ভেঙে পড়লে চলবে না। তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে। তাই ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে নাস্তা না খেয়েই তোমাকে লিখতে বসেছি।

পারভীন, তুমি একজন ডাক্তার। যদিও আমি তোমার মতো ডাক্তার নই, তবুও শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু জ্ঞান আছে। আমার জ্ঞান হলো খুবই ক্ষুদ্র! শুধু জানার জন্যে জানা। আমাদের এ শরীর কিছুই নয়! আমাদের ছোট্ট এই শরীর খুবই ঠুনকো। অল্পতেই সে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তারপর সে একদিন মাটির সাথে মিশে যায়।

সৃষ্টির শুরু থেকে তাই হয়েছে। আমার জীবনে অসংখ্য মৃত্যু এসেছে। এসব মৃত্যুকে মেনে নিতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে আমার স্বামীর আকস্মিক অকাল মৃত্যু ছিল আমার জন্য ভয়াবহ কষ্টের ও শোকের! তারপর যখন আমি মেনে নিলাম তখনই আমি কিছুটা সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর একা একাই পথ চলা শুরু করলাম। আমি নিশ্চিতই জানি আজ নয় কাল আমিও মরে যাব।

আমাদের প্রিয় ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরানে মহান আল্লাহ সুবহানুতালা একাধিক স্থানে বলেছেন--"নিশ্চয়ই সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

পারভীন, তুমি তো জানো এখন সময়টা খুব খারাপ! সারা বিশ্বে করোনা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। তোমাকে শক্ত হতে হবে। তুমি সেদিন বললে তুমি খেতে পারছ না। তোমার গলা দিয়ে নামছে না। এটা খুবই স্বাভাবিক। আমার অনুরোধ, তুমি একটু খেতে চেষ্টা করো। তোমার শরীরটাকে এখন সুস্থ রাখতে হবে বোন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন--

"যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

পারভীন, বোন, জীবনের যত ভালো-মন্দ, যত সুখ-দুঃখ ও শোক, জীবনের সব রকম সত্যকে মেনে নিয়েই আমাদের এ জীবন। আমাদের পথচলা বার বার আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আমরা মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ি। তবুও থেমে থাকলে চলবে না। এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম। তুমিও এগিয়ে চলো। তোমার জন্য অনেক

দোয়া রইল। মহান আল্লাহ সুবহানুতালা যেন তোমাকে মানসিক শক্তি দান করেন।

--তোমার গেইন্সভিলের আপু চাপা রহমান"

উত্তরে পারভীন আমাকে লিখেছে--

"Thank you so much apu so much. It is very thoughtful and nice of you. Thank you for your thoughtful, supportive, and unique letter. I feel honored and blessed to know you especially during this time of great sorrow. And I am very happy to have a big sister like you. I will remember this forever.

May Almighty Allah grant my father highest place of Jannatul fardus. And May Allah blesses us all. Ameen.

Love you apu so much."

পারভীন আমাকে আরও লিখেছে--"Chapa Rahman, love you Apu. Love you so much. I feel your care, love and prayers through your writing. I will always remember this. I will also read your letter every day to gain my strength. Love you Apu. May Allah bless you."

এই সব কমেন্টের সারমর্ম হলো--"আপু, আপনার চিঠি থেকে আমি অনেক শক্তি অর্জন করেছি। এই চিঠি থেকে আমি আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা, আপনার কেয়ার এবং আপনার দোয়া অনুভব করি। প্রতিদিন একবার আমি আপনার চিঠি পড়ি। আপনার মতো একজন বড় বোন পেয়ে আমি খুবই খুশি। আপনাকে ভালোবাসি আপু। আল্লাহ আপনার ভালো করুন। আমি আপনার এই চিঠি পেয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আপনার এই চিঠি আল্লাহর বিশেষ রহমত স্বরূপ আমার কাছে। আমি সব সময় এই কথা মনে রাখব। আমি আমার বাবার জন্য আল্লাহর দরবারে জান্নাত প্রার্থনা করি।"

ইউনুস চাচার মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা পারভীন আয়োজিত ফ্লোরিডার এই দোয়ার অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা সবই ইউনুস চাচার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ সুবহানুতালা যেন চাচার সব গুনাহ মাফ করে তাঁকে জান্নাতে অধিষ্ঠিত করেন। আমিন।

A Tribute to Dr. Yunus Ali Khan

Dr. Bashir Ahmed

We lost a legendary humanitarian, physician, and a caring father on 24 June 2020. I have seen him few times in social gatherings and outings in Ocala, Orlando, Jacksonville, and Gainesville area. He attended different events organised by Bangladesh Medical Association of Florida and shared his professional and life experiences.

He will remain an example for the service he provided to his people and humanity. One of the humble persons I have seen without aû prejudice, reservations, and a believer of free thinking. He had all the opportunities to live a comfortable life in USA and Bangladesh. But he chose to dedicate his service to his people and served until the last days of his life to the roots he came from. It is a rarity in current days.

That is why Allah gave him the honor of the martyrs at the time of pandemics. I pray for the peace of his soul and may Allah make his eternal journey as peaceful as possible. I also believe that he raised his children with the values he upheld all his life and his mission will continue through the hands of his next generations.

A tribute to Dr. Yunus Ali Khan

Tahsin Ara

It is an honor to write this tribute to Dr. Younus Ali Khan--I have known him since my childhood. He was a friend of my beloved father, Late Anwar Hussain Manik, and the father of my very best friend, Dr. Ismat Ara. To me, he was not only a physician but a dearly loved father-figure as well. I consider myself blessed to have called him my uncle. He was a wonderful human being. I still remember his welcoming voice and the warm smile that he invariably had on his face.
60
Being a doctor, I have had the opportunity of working with him in Shahyadpur for few years. Maû of his female patients had also been my patients, and they were immensely satisfied with his care. He had a great deal of knowledge and compassion. He always helped those in need and served underprivileged people in remote areas. He was the kind of doctor that the health care system in Bangladesh needs more of.

Sadly, this honorable physician passed away on June 24, 2020, after suffering from deadly corona virus. He will be truly missed for his amaying expertise and remembered forever through his kind deeds.

The two pure souls--Uncle (Dr. Yunus Ali Khan--on the left) with my father (Md. Anwar Hussain Manik--on the right) at our house in Shahyadpur. Both of them left us forever! May Allah grant them jannah!

My grandpa, Dr.Yonus Ali Khan

Afia

He was an amaying hero, doctor, helper, son, nephew, father, brother, cousin, uncle, grandfather and most importantly, he meant the world to maû of us.I remember going to nursery in Italy and seeing that everyone brought their grandparents to school which made me upset since my grandfather died before I was born but I always knwe that his brother (my grandpa) will always be there for me and I respected him for being a very hard worker.

Since I was little, my mum told me that we went to his house and he adored, cared for me and gave me a golden necklace.I cherish every moment I had with him like when my uncle had go to the hospital urgently so my mum had to leave me behind, fwe days after, I went to the hospital with him. As I wasnt eating on the journey, my aunt frightened me by saying that grandpa would inject me but knowing that he was a good doctor, comforted me. I also remember the time when he came to my cousin's wedding with his daughter who I never met before as she lived in America (Rita Aunty) and I lived on the other side of the world. We had so much fun that it was like as if we had always known each other all along. It was my first ever time being in an event with grandpa. I performed a dance at my cousin&'s wedding, he told me I was a good dancer; I do get good grades and I'm happy that I made him proud. He wished for me to be a great person like he is. Every time we called him, he would always talk about these moments. I wish I was able to hang out with him a little bit more.

He keeps a special place in my heart and I'll forever cherish every second I had with him. I am thankful I was able to be apart of his life and I am grateful he was a part of mine.When I was leaving Bangladesh to go back home, at the airport, I was flooding rivers as the thought of leaving this outstanding person behind.

We planned for him to come to England and meet the world I live in but sadly, corona interrupted our plans and dreams. May Allah keep him in peace.

A comments from
Dr. Asm Rahman and Eva Malek

Dignity, respect, decency, modesty. There are among the best qualities of my dearly departed uncle, Dr. Yunus.
As I have gotten to know him over the years, my respect for Dr. Yunus has grown infinitely. I'm so glad to have shared so many engaging interactions with him. His deep love for his home country, Bangladesh, was clear in every conversation we had. His visits often coincided with my own father's visits and they never had a shortage of things to say. It gave me so much satisfaction and happiness to be able to unite my and Pervin apa's fathers. Dr. Yunus embodies hope and talent, and his compassion for humanity is unmatched. May he rest in peace.
Sincerely,
Dr. Asm Rahman and Eva Malek

Abdur Razzaque razzaque.paura@gmail.com
(লেখাটির শিরোনাম ও লেখকের নাম দরকার)

অসুখে বিসুখে অসুস্থতায় সৃষ্টিকর্তার পরেই মানুষ যাদের শরণাপন্ন হয় সেই মহান পেশার মানুষ হলেন ডাক্তার। সেবার ব্রত নিয়েই যারা নিজেদের আত্ব নিয়োগ করেন চিকিৎসা সেবার মত মহৎ পেশায়। প্রতিটা সেক্টরেই ভাল ও মন্দ দুই শ্রেণীর মানুষ থাকে, তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আছে। রাগ অভিমানে এই পেশার মানুষকেই অনেক সময় কশাই বলতে শোনা যায় আবার এই মানুষগুলো দ্বারা উপকৃত হয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রাণভরে দোয়াও করেন অনেকে।

চিকিৎসাসেবা একটি অনন্য শিল্প বা সেবা। একে প্রায়োগিকভাবে রপ্ত করতে হয়। জানতে হয় বিস্তর। আত্নস্থ করতে হয় হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে। সব কাজের মধ্যে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী আছে, তেমনি চিকিৎসা সেবার মধ্যেও আছে। সবকিছু ছাপিয়ে চিকিৎকের উত্তম ব্যবহার, হাতের যশ, রোগ নির্ণয়, তার সঠিক চিকিৎসা প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবার একজন অনুকরণীয় ব্যাক্তি হিসাবে গড়ে উঠেন। অনেক চিকিৎসক আছেন যাদের কোন আবেগ ও হৃদয়ের ভাবাবেগ থাকে না। যেন রোবটিক ফাঁপা, নিষ্প্রাণ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা করা। এরকম চিকিৎসকদের সাধারণ মানুষ মোটেই পছন্দ করেন না। চিকিৎসা করতে হয় রোগের ধরণ বুঝে আর বাস্তবতা দিয়ে। তাইলেই রোগ দূরীভূত হবে। সেই রকম একজন ভাল মানের, ভাল মনের তথা মানবিকবোধ সম্পন্ন একজন চিকিৎসক। তাঁর আচরণেই রোগীর ৫০% রোগ ভাল হয়ে যাবে। তাঁর কাছে চিকিৎসা নিতে আসা অনেক রোগী ও অভিভাবকের অভিমত। যাঁর কথা বলছিলাম তিনি শাহজাদপুরে গরীবের ডাক্তার হিসাবে খ্যাত ডাক্তার ইউনুছ আলী খান। শাহজাদপুর তথা বৃহত্তর পাবনাতে তাঁর খ্যাতি রয়েছে।

যখন থেকে বুঝবার বয়স হয়েছে, তখন থেকে তাঁর নাম, যশ খ্যাতির কথা শুনে আসছি। তখন থেকেই তাঁকে একবার দেখার খুব বাসনা ছিল। সেই আশা পূরণ হলো আমার ইমিডিয়েট বড় বোনের অসুস্থার কারনে। প্রায় মৃত পথযাত্রী আমার বোনকে চিকিৎসা দিয়ে বলা যায় দ্বিতীয় জীবনদান করলেন। ধীরে ধীরে আরো বড় হতে থাকি ততই তাঁর নাম, যশ খ্যাতির কথা শুনে আসছি এবং সেই সাথে তাকে আরো গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে পারি। বিস্মিত হলাম এটা জেনে যে তিনি সরকারী লোভনীয় চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে শাহজাদপুরের মাটি ও মানুষের সাথে মানবতার ফেরীওয়ালার মত চিকিৎসাসেবা দেওয়া ব্রত গ্রহণ করেন। গরীবের ডাক্তার হিসাবে খ্যাতির কারন আমি নিজে বহুবার দেখেছি, রোগী যে ফি দিত, তা কখনো কত দিলো

তা না দেখে পকেটে রাখতেন। পাশাপাশি যাদের ফে দেওয়ার সামর্থ নাই, তার কাছ থেকে ফি নিতেন না, উপরোক্ত সাধ্যমত কিছু ঔষধ বিনামূল্যে দিয়ে দিতেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে অনেকে অনেক সুন্দরভাবে তাঁকে চিত্রায়ীত করেছেন বা তুলে ধরেছেন। কিন্ত আমি বেশীভাগ লেখায় দেখেছি তাঁকে একটা বৃত্বের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার। তখন আমি বাম রাজনীতিতে একজন সক্রিয় অবস্থানে ছিলাম। সেই সুবাধে তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য শুনে তখন আমার মনে হয়েছে তিনি একজন বহুমাত্রিক সত্যিকারের একজন মানবিক মানুষ। নিভৃতচারী এই মানুষটি একজন বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুসারী ও স্বাধিনতার পরবর্তী ১৯৭২ সালের সংবিধানের কট্টর সমর্থক। সেই সংবিধানে চার মূলনীতি তিনি অন্তরের অন্তর্স্থলের ধারণ করতেন। নিভৃতচারী বলছি এজন্য যে স্বাধিনতা পরবর্তী নানা চরাই উৎরাইয়ের মধ্যে তিনি শাহজাদপুরের রাজনীতির নেতৃত্বে আসা বা চাইলে তিনি একজন সংসদ সদস্য হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে সমাজে, রাজনীতিতে ও পারিবারিক জীবনে সত্যিকারের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাষ্টের একজন নেতা হয়েও কিভাবে সঠিকভাবে রাষ্ট পরিচালনা করা যায়, তা তিনি তাঁর সূদীর্ঘ কর্মজীবনের যেখানেই কাজ করেছেন, সেখানেই তিনি পথ দেখিয়েছেন। এতকিছুর মাঝে একটা পরিবারের প্রধান বা পিতা হিসাবে সন্তানদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে একজন মানবিক মানুষ হওয়া যায়। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই তিনি নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত যেমন দেখিয়েছেন। সেজন্য যথার্থভাবে তাঁকে বলা যায় একটা প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ভাল মানুষ তৈরী হবে। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূচী তিনজন কন্যাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। যার কারনে আমরা দেখতে পাই তাঁর তিন সন্তান নিজ নিজ অবস্থানে যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি যোগ্য পিতার যোগ্য অনুসারী হয়ে নিজ পেশায় যেমন দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন, তেমনি লোক চক্ষুর অন্তরালে মানবতার ফেরিওয়ালা হিসাবে কাজ করছেন। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই তিনি নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত যেমন দেখিয়েছেন। সেজন্য যথার্থভাবে তাঁকে বলা যায় একটা প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ভাল মানুষ তৈরী হবে। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূচী তিনজন কন্যাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। যার কারনে আমরা দেখতে পাই তাঁর তিন সন্তান নিজ নিজ অবস্থানে যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি যোগ্য পিতার যোগ্য অনুসারী হয়ে নিভৃতে অসহায় মানুষের পাশে দারাচ্ছেন। শাহজাদপুরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা বলা বাহুল্য। শাহজাদপুরে প্রথমে এক্সে মেশিন তিনি নিয়ে আসেন। অন্ধকারে একটা মোম জ্বালালে যেমন তার চতুর্দিকে আলোকিত হয়ে উঠে, তেমনি ডাঃ ইউনুছ আলী খানের কর্মজীবন ও ব্যাক্তি ডাঃ ইউনুছ আলী খানের পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন, রুচীবোধ যেদিকেই তাকাই না কেন, সবদিকেই তিনি যেন আলোকিত করে রেখেছেন। আর তাই আমি বার বার বলি তাঁকে দেখতে হবে বৃত্তের বাইরে থেকে। একজন মানুষ জন্ম নিলে মরতে হবে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষটি পৃথিবীতে এসে কি রেখে গেলেন সেটাই মূখ্য। তাঁকে একটা প্রতিষ্ঠানের

সাথে তুলনা করেছি এজন্য যে তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আর এটাই একজন সফল নেতৃত্বের কাজ। কোন বিষেসনেই তাঁকে বিষেসায়িত করা সম্ভব না। কারন তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই আলো ছড়িয়েছেন। তাই আমি বলতে চাই তিনি শুধু শাহজাদপুরের বাতি ঘর না, তিনি একজন মানবতার ফেরী ওয়ালা এবং সকল মানুষের বাতি ঘর।